এবং যাহার শেষ উদ্দেশ্য, অবস্থানুযায়ী যোগ্যতাকে পরিহার করিয়া নৈতিক শ্রেষ্ঠতাকে রক্ষা করা।

জাগতিক পদ্ধতির স্থলে নৈতিক পদ্ধতিকে সমাজে স্থান দিতে হইলে নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারিতার পরিবর্ত্তে আত্মসংযম অবলম্বন করিতে হইবে, সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপসারিত বিদলিত না করিয়া পরস্পরকে সাহায্য করিতে হইবে—যাহাতে করিয়া কেবল যোগ্যতম রক্ষা না পায়, পরন্তু সাধ্যমত সম্ভবমত অনেকেই রক্ষা পাইবার যোগ্য হয়। আইন এবং নীতিসূত্র সকল জাগতিক পদ্ধতিকে বাধা দিয়া সমাজের প্রতি প্রত্যেকের কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতেছে, তাহারই আশ্রয় ও প্রভাবে কেবল যে, প্রত্যেকে জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে তাহা নহে, পাশব বর্ব্বরতার আকর্ষণ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিয়াছে।

অতএব এ কথা বিশেষরূপে মনে ধারণা করা কর্ত্তব্য যে, জাগতিক পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া, অথবা তাহার নিকট হইতে সত্রাসে পলায়ন করিয়া সমাজের নৈতিক উন্নতি হয় না, তাহার সহিত সংগ্রাম করাই প্রকৃষ্ট উপায়। আমরা ক্ষুদ্র পরমাণু হইয়া বিশ্বজগতের সহিত লড়াই করিতে বসিব এ কথা স্পর্দ্ধার মত শুনিতে হয় কিন্তু আধুনিক জ্ঞানোন্নতি পর্য্যালোচনা করিলে ইহা নিতান্ত দুরাশা বলিয়া বোধ হয় না।

সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় মানুষ ক্রমে ক্রমে বিশ্বজগতের মধ্যে একটি কৃত্রিম জগৎ রচনা করিতেছে। প্রত্যেক পরিবারে, প্রত্যেক সমাজে শাস্ত্র ও লোকাচারের দ্বারা মানবাশ্রিত জাগতিক পদ্ধতি সংযত ও রূপান্তরিত হইয়াছে এবং বহিঃপ্রকৃতিতেও পশুপাল কৃষী ও শিল্পীর দ্বারা তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়া হইয়াছে। যতই সভ্যতা বৃদ্ধি হইয়াছে ততই প্রকৃতির কার্য্যে

মানুষের হস্তক্ষেপ বাড়িয়া আসিয়াছে, অবশেষে শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতিসহকারে মানববহির্ভূত প্রকৃতির উপরে মানুষের প্রভাব এতই প্রবল হইয়াছে যে, পুরাকালে ইন্দ্রজালেরও এত ক্ষমতা লোকে বিশ্বাস করিত না।

কিন্তু, অভিব্যক্তিবাদ মানিতে গেলে ধরাধামে ভূস্বর্গ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর বলিয়া আশা হয় না। কারণ, যদিচ বহুযুগ ধরিয়া আমাদের পৃথিবী উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে তথাপি এক সময়ে তাহার শিখর-চূড়ায় উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার তাহাকে নিম্নদিকে যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে। এ কথা কল্পনা করিতে সাহস হয় না যে, মানুষের বুদ্ধি ও শক্তি কোনকালে কালের গতিকে প্রতিহত করিতে পারিবে।

তাহা ছাড়া, জাগতিক প্রকৃতি আমাদের আজন্ম সঙ্গী, আমাদের জীবনরক্ষার সহায় এবং তাহা লক্ষ লক্ষ বৎসরের কঠিন সাধনায় সিদ্ধ ;—কেবল কয়েক শতাব্দীর চেষ্টাতেই যে, তাহাকে নৈতিক নিগড়ে বদ্ধ করা যাইতে পারিবে এ আশা মনে পোষণ করা মূঢ়তা। যতদিন জগৎ থাকিবে,বোধ করি ততদিনই এই কঠিনপ্রাণ প্রবল শত্রুর সহিত নৈতিক প্রকৃতিকে যুদ্ধ করিতে হইবে।

অপর পক্ষে, মানুষের বুদ্ধি এবং ইচ্ছা একত্র সম্মিলিত ও বিশুদ্ধ বিচারপ্রণালীর দ্বারা চালিত হইয়া জাগতিক অবস্থাকে যে কতদূর অনুকূল করিয়া তুলিতে পারে তাহারও সীমা দেখা যায় না। এবং মানবপ্রকৃতিরও কতদূর পরিবর্ত্তন হইতে পারে তাহা বলা কঠিন। যে মানুষ নেকড়ে বাঘের জাতভাইকে মেষরক্ষক কুকুরে পরিণত করিয়াছে, সে মানুষ সভ্য মানবের অন্তর্নিহিত বর্ব্বরপ্রবৃত্তিগুলিকেও যে, বহুলপরিমাণে দমন করিয়া আনিতে পারিবে এমন আশা করা যায়।

জগতে অমঙ্গল দমন করা সম্বন্ধে আমরা যে পুরাকালের নীতিজ্ঞদের অপেক্ষা অধিকতর আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছি সে আশা সফল করিতে হইলে, দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়াই যে, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এ মতটা দূর করিতে হইবে।

আর্য্যজাতির শৈশবাবস্থায় যখন ভাল এবং মন্দ উভয়কেই ক্রীড়াসহচরের ন্যায় গ্রহণ করা যাইত সে দিন গিয়াছে; তাহার পরে যখন মন্দর হাত হইতে এড়াইবার জন্য গ্রীক এবং হিন্দু রণক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়নোদ্যত হইলেন সে দিনও গেল; এখন আমরা সেই বাল্যোচিত অতিশয় আশা এবং অতিশয় নৈরাশ্য পরিহার করিয়া বয়স্ক লোকের ন্যায় আচরণ করিব; কঠিন পণ ও বলিষ্ঠ হৃদয় লইয়া চেষ্টা করিব, সন্ধান করিব, উপার্জ্জন করিব এবং কিছুতে হার মানিব না; ভাল যাহা পাইব তাহাকে একান্ত যত্নে পালন করিব এবং মন্দকে বহন করিয়া অপরাজিত হৃদয়ে তাহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিব; হয় ত সমুদ্র আমাদিগকে গ্রাস করিবে, হয় ত বা সুখময় দ্বীপে উত্তীর্ণ হইতে পারিব, কিন্তু সেই অনিশ্চিত পরিণামের পূর্ব্বে এমন অনেক নিশ্চিত কার্য্য সমাধা হইবে যাহাতে মহত্ত্বগৌরব আছে।

বিনিপয়সায় ভোজ।

আপিসের বেশে অক্ষয় বাবু।

(হাসিতে হাসিতে) আজ আচ্ছা জব্দ করেছি। বাবু রোজ আমাদের স্কন্ধে বিনামূল্যে বিনামাশুলে ইয়ার্কি দিয়ে বেড়ান আর লম্বা চওড়া কথা কন! মশায়, আজ বছর খানেক ধরে' রোজ

বলে আজ খাওয়াব কাল খাওয়াব, খাওয়াবার নাম নেই! যতখানি আশা দিয়েছে তার শিকি পরিমাণ যদি আহার দিত তা' হ'লে এত দিনে তিনটে রাজস্থয় যজ্ঞ হতে পারত, যা হোক আজ ত বহু কষ্টে একটা নিমন্ত্রণ আদায় করা গেছে। কিন্তু দুটি ঘণ্টা বসে' আছি এখনো তার দেখা নেই। ফাঁকি দিলে না ত? (নেপথ্যে চাহিয়া) ওরে কি তোর নাম, ভূতো, না মোধো, না হরে?

চন্দ্রকান্ত? আচ্ছা বাপু তাই সই! তা ভাল চন্দ্রকান্ত, তোমার বাবু কখন্ আসবে বল দেখি?

কি বল্লি? বাবু হোটেল থেকে খাবার কিনে আন্‌তে গেছেন? বলিস্ কিরে? আজ তবে ত রীতিমত খানা! ক্ষিদেটিও দিব্যি জমে' এসেচে! মটনচপের হাড়গুলি একেবারে পালিশ করে' হাতির দাঁতের চুষিকাঠির মত চক্‌চকে করে' রেখে দেব! একটা মুর্গির কারি অবিশ্যি থাক্‌বে—কিন্তু কতক্ষণই বা থাক্‌বে? আর দুরকমের দুটো পুডিং যদি দেয় তা' হলে চেঁচেপুঁচে চীনে বাসনগুলোকে একেবারে কাঁচের আয়না বানিয়ে দেব! যদি মনে করে' ডজনতুত্তিন অয়ষ্টার প্যাটি আনে তা' হলে ভোজনটি বেশ পরিপাটি রকমের হয়! আজ সকাল থেকে ডান চোখ নাচ্‌চে, বোধ হয় অয়ষ্টার প্যাটি আস্‌বে! ওহে ও চন্দ্রকান্ত, তোমার বাবু কখন গেছেন বল দেখি?

অনেকক্ষণ গেছেন? তবে আর বিস্তর বিলম্ব নেই। ততক্ষণ একছিলিম তামাক দাও না! অনেক্ষণ ধরে' বলচি কিন্তু তোমার কোন গা দেখচিনে!—

তামাক বাইরে নেই? বাবু বন্ধ করে' রেখে গেছেন? এমন ত কখন শুনিনি! এ ত কম্পানির কাগজ নয়! কি করা যায়!

আমি একটু-আধটু আফিম খাই তামাক না হ'লে ত আর বাঁচিনে! ওহে মোধো, না না চন্দ্রকান্ত, কোন মতে মালিদের কাছ থেকে হোক্ যেখান থেকে হোক্ এক ছিলিম যোগাড় করে' দিতে পার না?

বাজার থেকে কিনে আন্‌তে হবে? পয়সা চাই? আচ্ছা বাপু তাই সই। এই নাও, এক পয়সার তামাক চট্ করে' কিনে নিয়ে এস।

এক পয়সায় তামাক হবে না? কেন হবে না? বাপু আমাকে কি মুচিখোলার নবাব বলে' হঠাৎ তোমার ভ্রম হয়েচে? যোলো টাকা ভরির অম্বুরি তামাক না হলেও আমার কষ্টেসৃষ্টে চলে' যায়—এক পয়সাতেই ঢের হবে।

হুঁকো কল্‌কেও কিনে আনতে হবে? সেও তোমার বাবু লোহার সিন্ধুকে পূরে রেখে গেছেন না কি? বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে সেফ্ ডিপজিট্ করে আসেন্‌নি কেন? ওরে বাস্‌রে! এ ত ভাল জায়গায় এসে পড়া গেছে দেখচি! তা' নাও, এই দু'টি পয়সা ট্র্যামের জন্যে রেখেছিলুম। উদয় ফিরে এলে তার কাছ থেকে সুদসুদ্ধ আদায় করে' নিতে হবে!—এই বুঝি বাবুর বাগানবাড়ি, তা' হলে এঁর ভদ্রাসন বাড়ী কি রকম হবে না জানি! কড়িগুলো মাথায় ভেঙ্গে না পড়লে বাঁচি। এই ত একখানি ভাঙ্গা চৌকি আস্‌বাবের মধ্যে! এ আমার ভর সইবে না! সেই অবধি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে পা ব্যথা হয়ে গেল—আর ত পারিনে—এই মাটিতেই বসা যাক্!

(কোঁচা দিয়া ধূলা ঝাড়িয়া একটা খবরের কাগজ মাটিতে পাতিয়া উপবেশন ও গুন্‌গুন্ স্বরে গান)

যদি জোটে রোজ
এমনি বিনি পয়সায় ভোজ!

ডিশের পরে ডিশ্
(শুধু) মটন্ কারি ফিশ্,
সঙ্গে তারি হুইস্কি,সোডা ছচার রয়াল্ ডোজ!
পরের তহবীল্
চোকায় উইল্‌সনের বিল্;
থাকি মনের সুখে হাস্যমুখে কে কার রাখে খোঁজ!—

কইরে! তামাক এল? ও কিরে! শুধু কল্‌কে? হুঁকো কই? এখানে ছ পয়সায় হুঁকো পাওয়া যায় না? কল্‌কেটার দাম ছ আনা! হ্যা দ্যাখ বাপু চন্দ্রকান্ত, বাইরে থেকে আমাকে দেখে যতটা বোকা মনে হয় আমি ততটা নই! শরীরটা যেমন মোটা বুদ্ধিটা তার,চেয়ে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম! তোমার বাবু যে,হুঁকোটা কল্‌কেটা তামাকটা পর্য্যন্ত আয়রণ্-চেষ্টে তুলে রেখে দেন এতক্ষণে তার কারণ বোঝা গেল। কেবল তোমার মত রত্নটিকে বাইরে রাখাই তাঁর ভুল হয়েচে। বোধ হয় বেশি দিন বাইরে থাক্‌তেও হবে না! কোম্পানি বাহাদুর একবার খবরটি পেলেই পাহারা বসিয়ে খুব হেপাজতের সঙ্গেই তোমাকে রাখ্‌বেন! যা হোক্ তামাক না খেয়ে ত আর বাঁচিনে! (কলিকায় মুখ দিয়া তামাক টানিয়া কাশিতে কাশিতে) ওরে বাবা, এ কোথাকার তামাক! এ যে উইল্ করে' টানতে হয়! এর ছ'টান টান্‌লে স্বয়ং বাবা ভোলানাথের মাথার চাঁদি ফট্ করে' ফেটে যায়, নন্দীভৃঙ্গীর ভীর্ম্মি লাগে! কাজ নেই বাপু, থাক্! বাবু আগে আসুন! কিন্তু বাবুর আসবার জন্যে ত কোন রকম তাড়া দেখচিনে! সে বোধ হয় প্যাটিগুলো একটি একটি করে' শেষ করচে! এ দিকে আমার পেট এমনি জলে উঠেছে যে, মনে হচ্ছে যেন এখনি কোঁচায় আগুন ধরে' যাবে! তৃষ্ণাও পেয়েছে। কিন্তু জল চাই-

সেই আমাদের চন্দ্রকান্ত বলে' বসবেন গেলাম্‌ কিনে আনতে হবে, বাবু বন্ধ করে' রেখে গেছেন। কাজ নেই, বাগানের ডাব খাওয়া যাক্‌।

ওহে বাপু চন্দ্র, একটি কাজ করতে পার? বাগান থেকে চট্‌ করে' একটি ডাব পেড়ে আনতে পার? বড় তেষ্টা পেয়েচে!—

কেন? ডাব পাওয়া যাবে না কেন? বাগানে ত ডাব বিস্তর দেখে এলুম?

সব গাছ জমা দেওয়া হয়েছে? তা' হোক্‌ না বাপু, একটি ডাবও মিল্‌বে না?

পয়সা চাই? পয়সা ত আর নেই! তবে থাক্‌, বাবু আসুন তার পরে দেখা যাবে!—সঙ্গে মাইনের টাকা আছে কিন্তু ওকে ভাঙ্গাতে দিতে সাহস হয় না। এখনো কোম্পানির মুল্লুকে যে, এত বড় একটি ডাকাত বাইরে ছাড়া আছে তা' আমি জানতুম না!—যাই হোক্‌ এখন উদয় এলে যে বাঁচি!

ঐ বুঝি আসচে! পায়ের শব্দ শুনচি। আঃ বাঁচা গেল। ওহে উদয়, উদয়! কই, না ত। তুমি কে হে?—

বাবু তোমাকে পঠিয়ে দিলেন? তার চেয়ে নিজে এলেই ত ভাল করতেন! ক্ষিধেয় যে মারা গেলুম!

হোটেলের বাবু? কেরাণী বাবু? কই, তাঁর সঙ্গে আমার ত কোন আত্মীয়তা নেই। কিছু খাবার পাঠিয়েচেন বল্‌তে পার? অয়ষ্টার প্যাটি?

পাঠান নি? বিল পাঠিয়েচেন? কৃতার্থ করেচেন আর কি? যে বাবুটির নামে বিল্‌ তিনি এখানে উপস্থিত নেই!

আরে না রে না! আমি না! এও ত ভাল বিপদে পড়-লুম!—আরে মাইরি না! কি গেরো! তোমাকে ঠকিয়ে

আমার লাভ কি বাপু? আমি নিমন্ত্রণ খেতে এসে তিন ঘন্টা এখানে বসে' আছি—তুমি হোটেল থেকে আস্‌চ, তবু তোমাকে দেখেও অনেকটা তৃপ্তি হচ্চে! বোধ হয় তোমার ঐ চাদরখানা সিদ্ধ করলে ওর থেকে নিদেন পোয়াটাক্ বিফ্-স্যুপ্ বেরোয়! ভয় নেই, আমি তোমার চাদর নেব না, কিন্তু বিল্‌টিও চাইনে।

এ ত ভাল মুস্কিল দেখ্‌চি! ওগো না গো না! আমি উদয় বাবু নই, আমি অক্ষয় বাবু! কি গেরো! আমার নাম আমি জানিনে তুমি জানো! অত গোলে কাজ কি বাপু, তুমি নীচে গিয়ে একটু বোসো উদয় বাবু এখনি আস্‌বেন।

বিধাতা সকাল বেলায় এই জন্যেই কি ডান চোখ নাচিয়েছিলে? হোটেল থেকে ডিনার না এসে বিল এসে উপস্থিত?

"সখি, কি মোর করম ভেল!

পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু, বজর পড়িয়া গেল!"

হে বিধি, তোমারই বিচারে সমুদ্রমন্থনে একজন পেলে সুধা আর একজন পেলে বিষ, হোটেলমন্থনেও কি একজন পাবে মজা আর একজন পাবে তার বিল্! বিলটাও ত কমদিনের নয় দেখ্‌চি!

তুমি আবার কে হে? বাবু পাঠিয়ে দিলে? বাবুর যথেষ্ট অনুগ্রহ! কিন্তু তিনি কি মনে করেচেন তোমার মুখখানি দেখেই আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হবে? তোমার বাবু ত বড় ভদ্রলোক দেখচি হে?

কি বল্লে? কাপড়ের দাম? কার কাপড়ের দাম?

উদয় বাবু কাপড় কিন্‌বেন আর আমি তার দাম দেব! তোমারও ত বিবেচনাশক্তি বেশ দেখ্‌চি!

সত্যি না কি? কিসে ঠাওরালে আমারই নাম উদয় বাবু?

কপালে কি সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে রেখেচি? আমার অক্ষয় বাবু নামটা কি তোমার পছন্দ হল না?

নাম বদ্‌লেছি? আচ্ছা বাপু শরীরটি ত বদ্‌লানো সহজ ব্যাপার নয়? উদয় বাবুর সঙ্গে কোন্‌খানটা মেলে বল দেখি?

উদয় বাবুকে কখনো চাক্ষুষ দেখনি?—আচ্ছা একটু সবুর কর তোমার মনের আক্ষেপ মিটিয়ে দেব। বিস্তর দেরি হবে না, তিনি এলেন বলে!

আরে মোলো! আবার কে আসে? মশায়ের কোথেকে আসা হল? মশায়েরও এখানে নিমন্ত্রণ আছে বুঝি?

বাড়িভাড়া? কোন্ বাড়ির ভাড়া মশায়? এই বাড়ির? ভাড়াটা কত হিসেবে?

মাসে সতেরো টাকা? তা হলে হিসেব করুন দেখি সাড়ে তিন ঘণ্টায় কত ভাড়া হয়?

ঠাট্টা করচিনে মশায়—মনের সেরকম প্রফুল্ল অবস্থা নয়! এ বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে আমি সাড়ে তিন ঘণ্টা কাল আছি। সে জন্যেও যদি ভাড়া দিতে হয় ত ন্যায্য হিসেব করে' নিন্! তামাকটা পর্য্যন্ত পয়সা দিয়ে খেয়েছি!

আজ্ঞে না, আপনি ঠিকটি অনুমান করতে পারেন নি—আপনার ঈষৎ ভুল হয়েচে—আমার নাম উদয় নয়, অক্ষয়! এ রকম সামান্য ভুলে অন্য সময় বড় একটা কিছু আসে যায় না কিন্তু বাড়ি ভাড়া আদায়ের সময় বাপ মায়ে যার যে নাম দিয়েচেন সেইটে বাঁচিয়ে কাজ করলেই সুবিধে হয়!

আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বল্‌চেন? মাপ করবেন, ঐটি পারব না! সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে' পেটের জ্বালায় মরচি, ঠিক যেই খাবারটি আসবার সময় হল অমনি আপনি

গাল দিচ্ছেন বলেই যে বাড়ি ছেড়ে চলে যাব আমাকে তেমন গর্দ্দভ ঠাওরাবেন না! আপনি ঐখানেই বসুন, যা যা বল্‌বার অভিপ্রায় আছে বলে যান্, আমি আহারান্তে বাড়ি ছেড়ে যাব!

বকে বকে আমার গলা শুকিয়ে এল, আর ত বাঁচিনে! ক্ষিধের নাড়িগুলো বেবাক্ হজম হয়ে গেল! ঐ যে পায়ের শব্দ! ওহে উদয়, আমার অন্ধের নড়ি, আমার সাগরসেঁচা সাত রাজার ধন মাণিক, একবার উদয় হও হে! আর ত প্রাণ বাঁচে না!

তুমি আবার কে হে? যদি গালমন্দ দেবার থাকে ত ঐখানে বসে আরম্ভ করে দাও! দোহার্‌কি করবার অনেকগুলি লোক উপস্থিত আছেন!

হরি বাবু আমাকে ডেকে পাঠিয়েচেন? শুনে বড় সন্তোষ লাভ করলুম! তিনি আমাকে খুব ভালবাসেন সন্দেহ নেই কিন্তু আমার পরমবন্ধু যাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে' পাঠিয়েছেন তাঁদের কোন দেখাসাক্ষাৎ নেই, আর যাঁদের সঙ্গে আমার কোন কালে কোন পরিচয় নেই তাঁরা যে আজ প্রাতঃকাল থেকে আমাকে এত ঘন ঘন খাতির করচেন এর কারণ কি? আচ্ছা মশায় হরি বাবু নামক কোন একটি ভদ্রলোক আমাকে কেন এমন অসময়ে স্মরণ করলেন, এবং হঠাৎ এতই অধৈর্য্য হয়ে উঠ্‌লেন বল্‌তে পারেন কি?

কি! আমি আমার স্ত্রীর বালা গড়াবার জন্যে তাঁর কাছ থেকে নমুনাস্বরূপ গহনা এনে ফিরিয়ে দিচ্চিনে?—দেখ, এ সম্বন্ধে আমার অনেকগুলি কথা বলবার ছিল কিন্তু আপাততঃ একটি বল্লেই যথেষ্ট হবে—আমি কারো কাছ থেকে কোন গহনা আনি নি এবং আমার স্ত্রীই নেই। প্রধান প্রধান কথা আর যা' বল্‌বার ছিল সে আজকের মত মাপ করবেন—গলা শুকিয়ে

তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরচি! আপনি আর আধ ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করুন সমস্ত সমাচার অবগত হবেন! (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে উদয়, ওরে উদো, ওরে লক্ষীছাড়া হতভাগা পাজি ছুঁচো ড্যাম শুয়ার ইষ্টুপিড্—ওরে পেট যে জলে গেল, গলা যে শুকিয়ে যায়, মাথা যে ফেটে যাচ্চে—ওরে নরাধম, কুলাঙ্গার!

আরে না মশায়—আপনাদের সম্ভাষণ করচিনে! আপনারা হঠাৎ চঞ্চল হবেন না। আমি পেটের জ্বালায় মনের খেদে আমার বন্ধুকে ডাক্‌চি। আপনারা বসুন্!

আর বস্‌তে পারচেন্ না? অনেক দেরি হয়ে গেছে? সে কথা আর আমাকে বল্‌তে হবে না! দেরি হয়েচে সন্দেহ নেই! তা' হলে আপনাদের আর পীড়াপীড়ি করে ধরে' রাখতে চাইনে। তবে আজকের মত আপনারা আসুন! আপনাদের সঙ্গে মিষ্টালাপে এতক্ষণ সময়টা বেশ সুখে কেটেছিল!

কিন্তু এখন যে কথাগুলো বল্‌চেন ওগুলো কিছু অধিক পরিমাণেই বল্‌চেন! খুব পরম বন্ধুকেও মানুষ ভালবেসে শ্যালক সম্ভাষণ কর্ত্তে হঠাৎ কুণ্ঠিত হয়, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে অতি অল্পক্ষণের আলাপেই যে আপনারা এতটা বেশি ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তা করচেন সে জন্যে আমি মনে মনে কিছু লজ্জা বোধ করচি! জান্‌বেন আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক কোন রকম অসদ্ভাব নেই কিন্তু আপনারা আমার কাছে যতটা প্রত্যাশা করচেন আমি ততটা দিতে একেবারে অক্ষম!

মশায়রা আর বাড়াবাড়ি করবেন না। আপনারা বোধ হয় দুবেলা নিয়মিত আহার করে' থাকেন, ক্ষিদে পেলে মানুষের মেজাজটা কি রকম হয় ঠিক জানেন না, তাই আমাকে এমন অবস্থায় ঘেঁটাতে সাহস করচেন!

আবার! ফের! দেখ বাপু, আমার সঙ্গে পারবে না! শরীরটা দেখেই বুঝ্তে পারচ না! বহু কষ্টে রাগ চেপে আছি পাছে একটা খুনোখুনি কাণ্ড করে' বসি! আচ্ছা, আমাকে রাগাও দেখি! দেখি তোমাদের কত ক্ষমতা! কিছুতেই রাগাতে পারবে না! এই দেখ আমি খুব গম্ভীর হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বস্লুম। ও বাবা! এরা যে সবাই মিলে মারধোর করবার যোগাড় করে! খালিপেটে ক্ষিদের উপর মারটা সয় না দেখেচি! আচ্ছা বাপু, তোমরা সবাই বোস! তোমাদের কার কত পাওনা আছে বল। ভাগ্যি মাইনের টাকাটা পকেটে ছিল নইলে আজ নিতা-ন্তই ধনঞ্জয়কে স্মরণ করে' একপেট ক্ষিদে সুদ্ধ দৌড় মারতে হত! আপাততঃ প্রাণটা বাঁচাই তার পর টাকাটা উদয়ের কাছ থেকে আদায় করে' নিলেই হবে!

তোমার পাঁচ টাকা বই পাওনা নয় কিন্তু তুমি পঞ্চাশ টাকার গাল পেড়ে নিয়েচ বাপু—এই নও তোমার টাকা!

ওহে বাপু, তোমার হোটেলের বিল এই শুধে দিচ্চি, যদি কখনো অসময়ে তোমাদের শরণাগত হতে হয় তা' হলে স্মরণ রেখো!

তোমার তিনমাসের বাড়িভাড়া পাওনা? অর্দ্ধেক টাকাটা আজ দিচ্চি বাকি পরে নিয়ো। তুমি ত ভাই তোমার গালমন্দ আমাকে ষোলো আনাই চুকিয়ে দিয়েচ, তাতে বোধ করি তোমার মনটা কতকটা খোলসা হয়েচে এখন আশীর্ব্বাদ করে' বাড়ি চলে যাও!

ওরে বাপু, তোমার গহনা ফিরিয়ে দেওয়া সহজ নয়। যদি আমার স্ত্রী থাক্তেন আর তোমার গয়না তাঁকে দিতুম তা' হলেও ফিরিয়ে আনা সম্ভব হত না; আর যখন তিনি বর্ত্তমান

নেই এবং তোমার গহনা তাঁকে দিইনি তখন ফিরিয়ে আনা আরো কত কঠিন তা' একটুখানি ভেবে দেখ্‌লে তুমিও হয় ত বুঝ্‌তে পারবে। তবু যদি পীড়াপীড়ি কর তা' হলে কাজেই তোমার হরিবাবুর ওখানে আমাকে যেতে হবে, কিন্তু খাবারটা আসে কি না আর একটু না দেখে যেতে পারচিনে!—উঃ! আর ত পারিনে! চন্দ্র, ওহে চন্দ্র! এখানে উদয়ের ত কোন সম্পর্ক নেই, এখন তুমি সুদ্ধ অস্ত গেলে আমি যে অন্ধকার দেখি! চন্দ্র! ওহে চন্দ্রকান্ত! এই যে এসেছ! চন্দ্র, তুমি ত তোমার বাবুকে চেন, সত্য করে' বল দেখি আজ কাল এবং পরশুর মধ্যে তিনি কি হোটেল থেকে ফিরবেন?

বোধ হয় ফিরবেন না? এতক্ষণ পরে তোমার এই কথাটি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্চে। যা' হোক্ বড্ড ক্ষিধে পেয়েচে এখন আর গাল দেবার সময় নেই, এই আধুলিটি নিয়ে যদি চট্ করে' কিছু খাবার কিনে আন তা' হলে প্রাণ রক্ষে হয়।

লোকটা নবাবী করে' বেড়ায় অথচ কাজকর্ম্ম কিছু নেই, আমরা ভাবতুম চালায় কি করে! এখন ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পারচি! কিন্তু প্রত্যহ এতগুলি গাল হজম করে', এতগুলি বিল্ ঠেকিয়ে, এতগুলো লোক খেদিয়ে রাখা ত কম কাণ্ড নয়! এতে মজুরি পোষায় না, এর চেয়ে ঘানি ঠেলেও সুখ আছে!

কি হে! শুধু মুড়ি নিয়ে এলে? আর কিছু পাওয়া গেল না? পয়সা কিছু ফিরেচে?

না? আচ্ছা, তবে দাও মুড়িই দাও। (আহার)

ওহে চন্দ্র, কি বল্‌ব, ক্ষুধার চোটে এই বাসি মুড়ি যেন সুধা বলে' বোধ হচ্চে! অনেক নিমন্ত্রণ খেয়েচি কিন্তু এমন সুখ পাইনি! চন্দ্র! তুমিই সুধাকর বটে কিন্তু আজকে কলঙ্কের

ভাগটাই কিছু বেশি দেখা গেল! ডাবও একটা এনেচ দেখ্‌চি, এর জন্যেও স্বতন্ত্র কিছু দিতে হবে না কি?

হবে না? শরীরে দয়ামায়া কিছু আছে বোধ হচ্চে, এখন যদি একটি গাড়ি ডেকে দাও ত আস্তে আস্তে বিদায় হই!

গাড়ি এখানে পাওয়া যায় না? তবে ত বড় বিপদে ফেল্লে? আমি এখন না খেয়ে কাহিল শরীরে দেড়ক্রোশ রাস্তা হাঁট্‌তে পারবো না; যখন সম্মুখে আহারের আশা ছিল তখন পেরেছিলুম। কি করব! বেরিয়ে পড়া যাক্‌!

কি সর্ব্বনাশ! এই সময়ে আবার হরিবাবুর ওখানে যেতে হবে! চন্দ্র, তুমি আজ আমার বিস্তর উপকার করেচ এখন আর কিছু করতে হবে না, এই ভদ্রলোকের ছেলেটিকে বুঝিয়ে দাও আমি উদয় বাবু নই, আমি আহিরিটোলার অক্ষয় বাবু।

ও তোমার কথা বিশ্বাস করচে না? সে জন্যে ওকে আমি বেশি দোষ দিতে পারিনে, বোধ হয় তোমাকে ও অনেক দিন থেকে চেনে! যা' হোক্‌ আর ঝগড়া করবার সামর্থ্য নেই, আস্তে আস্তে হরি বাবুর ওখানেই যাওয়া যাক্‌। বাপু, যে রকম অবস্থা দেখ্‌চ পথে যদি একটা কিছু ঘটে দাহ করবার ব্যয়টা তোমার স্কন্ধে পড়বে—আগে থাক্‌তে বলে' রাখ্‌লুম।

চন্দ্র, তুমি আবার হাত বাড়াও কেন হে? তোমাদের কল্যাণে যে রকম সস্তায় আজ নেমন্তন্ন খেয়ে গেলুম বহুকাল আমার আর ক্ষিদে থাক্‌বে না! আরও কি চাও?

ও! বক্‌শিশ্‌! সেটা চুকিয়ে দেওয়াই ভাল! যখন এতই করলেম তখন সর্ব্বশেষে ঐ খুঁৎটুকু আর রাখ্‌ব না। কিন্তু আমার কাছে আর একটিমাত্র টাকা বাকি আছে। তার মধ্যে

বারো আনা আমি গাড়ি ভাড়ার জন্যে রেখে দিতে চাই। তোমার কাছে খুচ্‌রো যদি কিছু থাকে তা' হলে ভাঙ্গিয়ে—

খুচ্‌রো নেই? (পকেট উল্টাইয়া শেষ টাকাটি দিয়া) তবে এই নও বাপু! তোমাদের বাড়ি থেকে বেরলুম একেবারে "গজ-ভুক্ত কপিথবৎ!"

কিন্তু এই যে টাকাগুলি দিলুম উদয়ের কাছ থেকে ফিরে আদায় করবার কি উপায় করা যায়? একটা দামি জিনিষ যদি কিছু পাওয়া যায় ত আটক করে' রাখি! দামী জিনিষের মধ্যে ত দেখ্‌চি ঐ চন্দ্রকান্ত! কিন্তু যে রকম দেখ্‌লুম ওঁকে সংগ্রহ করা আমার কর্ম্ম নয়, আমাকে উনি ট্যাঁকে গুঁজে নিতে পারেন।

(কোণে একটা দেরাজ সবলে খুলিয়া) বাঃ, এই ত ঠিক হয়েচে! চেনটিও দিব্যি! তা' হলে এইটি দখল করা যাক্!

কি হে চন্দ্র, এত ব্যস্ত কেন?

পুলিশ? পুলিশ আস্‌চে?

আমাকে পালাতে হবে? কেন, কি দুষ্কর্ম্ম করেচি? কেবল এক ভদ্রলোকের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেচি,তার যা' শাস্তি যথেষ্ট হয়েচে!

তাই ত সত্যিই দেখ্‌চি! চন্দ্র কোথায় গেল? হরি বাবুর সেই লোকটিকেও যে দেখ্‌চিনে! সবাই পালিয়েচে।

দেখ বাপু গায়ে হাত দিয়ো না! ভাল হবে না! আমি ভদ্রলোক! চোর নই জালিয়াৎ নই।

উঃ কর কি! লাগে যে! বাবা আজ সমস্ত দিন কেবল মুড়ি খেয়ে পথ চেয়ে আছি, আজ তোমাদের এ সব ঠাট্টা আমার ভাল লাগ্‌চে না।

পেয়াদা বাবা, বরঞ্চ কিছু জলপানী নাও! (পকেটে হাত

দিয়ে) হায় হায় একটি গয়না নেই! দারোগা সাহেব, যদি চোর ধরতে চাও, চল আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি! জেল সৃষ্টি হয়ে পর্য্যন্ত এত বড় চোর পৃথিবীতে দেখা দেয় নি।

কি করেচি বল দেখি? জীবন বাবুর নাম সই করে হ্যামিল্‌-টনের দোকান থেকে ঘড়ি এনেচি? পেয়াদা সাহেব, ভদ্রলোক হয়ে ভদ্রলোকের নামে ফস্ করে' এত বড় অপবাদটা দিলে?

ওকি ও! ওটা ধরে' টেনো না! ও আমার ঘড়ি নয়! শেষ কালে যদি চেন্‌মেন্ ছিঁড়ে যায় তা' হলে আবার মুস্কিলে পড়তে হবে।

কি! এই সেই হ্যামিল্‌টনের ঘড়ি? ও বাবা! সত্যি নাকি! তা' নিয়ে যাও নিয়ে যাও এখনি নিয়ে যাও! কিন্তু ঘড়ির সঙ্গে আমাকে সুদ্ধ টান কেন? আমি ত সোনার চেন নই! আমি সোনার অক্ষয় বটে, কিন্তু সেও কেবল বাপ মায়ের কাছে।

তা' নিতান্তই যদি না ছাড়তে পার ত চল। বাবা, আমাকে সবাই ভালবাসে, আজ তার বিস্তর পরিচয় পেয়েচি, এখন তোমার ম্যাজিষ্ট্রেটের ভালবাসা কোন মতে এড়াতে পারলে এ যাত্রা রক্ষে পাই।

যদি জোটে রোজ
এম্‌নি বিনি পয়সায় ভোজ!

মহাভিনিষ্ক্রমণ বৃত্তান্ত।

নগরের বাহিরে আসিয়া সিদ্ধার্থের কপিলবস্তুর প্রতি একবার শেষ দৃষ্টিপাত করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু তখনই যেন কে তাঁহাকে বলিল—"যখন মায়া কাটাইয়াছ, তখন আর মায়ার

দ্রব্য দেখিয়া কি হইবে?" তিনি আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া অগ্রসর হইলেন।

বৌদ্ধ পুস্তকে লিখিত আছে যে, যে মুহূর্ত্তে সিদ্ধার্থ রাজভবন-দ্বার অতিক্রম করিয়া আসিলেন, সেই মুহূর্ত্তে মার বলিয়া পাপ-পুরুষ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সে সিদ্ধার্থকে বলিল—"তুমি পিতা, পুত্র, স্ত্রী ও রাজ্য ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ? এমন কর্ম্ম কখন করিও না। সন্ন্যাসী হইয়া কি হইবে? আমি সপ্তাহ মধ্যে তোমাকে চারি দ্বীপের চক্রবর্ত্তী রাজা করিয়া দিব। শীঘ্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর।" সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে?" সে উত্তর দিল—"আমার নাম মার।" সিদ্ধার্থ বলিলেন—"আমি মনে করিলে রাজা হইতে পারি তাহা জানি। কিন্তু আমি তাহা হইব না। পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য লইয়া কি হইবে? সমস্ত মায়াবন্ধন কাটিয়া আমি বুদ্ধ হইব, ইহাই আমার মানস।" পাপপুরুষ পরাস্ত হইল। কিন্তু সে মনে মনে বলিল—"আচ্ছা, তুমি আমাকে ছাড়িলে কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়িতেছি না। কাম, ঈর্ষা এবং মোহ এই তিন অস্ত্র আমার হাতে। ইহাদিগের সাহায্যে আমি তোমাকে পরাস্ত করিব।" সেই পর্য্যন্ত যেমন ছায়া শরীরের অনুগমন করে, মার সিদ্ধার্থের অনুগামী হইল, আর তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না। *

---

* "মার" এই কথাটি সংস্কৃত তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যে অর্থে বৌদ্ধেরা ইহা ব্যবহার করে তাহা প্রচলিত অর্থ হইতে বিভিন্ন। বৌদ্ধেরা ইহা একটি বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করে। পারস্যদেশের ধর্ম্মসংস্কারক জোরোয়াস্তারের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, তিনিও পাপপুরুষ দ্বারা প্রলুব্ধ হন। তাহার নাম অহ্রিমান অথবা মেরিয় বা মৈর্য্য। মার এবং মৈরিয় এই দুইটি কথার বেশ সৌসাদৃশ্য আছে। সেই জন্য এ দুটি কথা প্রকৃত আর্য্য কথা, কেবল ভারতের কথা নহে। যখন পারস্য এবং ভারতের আর্য্যজাতিরা একত্রে অবস্থিতি করিত তখন তাহাদিগের মধ্যে এই কথাটি এই অর্থে ব্যবহৃত হইত বলিয়া বোধ হয়।

এই আখ্যায়িকাটি একটি সুন্দর রূপক বলিয়া বুঝিতে হইবে। সিদ্ধার্থের জীবনে মার বলিয়া পাপপুরুষের নাম আমরা সর্ব্বদা শুনিতে পাইব। সংস্কৃত অভিধানে ইহার অর্থ কাম। কিন্তু বৌদ্ধেরা ইহাতে একটি বিশেষ পুরুষত্ব আরোপ করে। কাম অথবা পাপ বলিয়া একজন বিশেষ পুরুষ আছে। লোকদিগের মনে পাপরাজ্য বিস্তার করাই তাহার কার্য্য। যখনি কেহ কোন সাধু উদ্দেশ্য পালন করিবে বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হয়, তখনি মার আসিয়া তাহাকে সুখ ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখাইয়া কুপথে আনিবার চেষ্টা করে। আমরা দেখিতেছি যে, বৌদ্ধ-ধর্ম্মে মার যাহাকে বলে খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মে সয়তান তাহাকেই বলে। পাপ বলিয়া একটি বিকার আছে ইহা সকলেই স্বীকার করে। ইহা মানুষের রক্তমাংসে সংযোজিত। যেখানে মানুষ সেইখানে পাপ। যখন মানুষ সবল, প্রকৃতিস্থ না থাকে, তখন এই বিকার আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। আমরা ইচ্ছা করিলেও, প্রাণপণে চেষ্টা করিলেও ইহাকে তাড়াইতে পারি না। যথেষ্ট সাধু ইচ্ছার সঙ্গে, ঘোর নিষ্ঠা ও তপস্যার মধ্যে, যখন জানিতেছি যে,—স্বর্গ আমার চক্ষের সম্মুখে, আর একপদ অগ্রসর হইলেই সেইখানে প্রবেশ করিতে পারি,—ঠিক তখনই পাপ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই যে পাপের এক বিশেষ ক্ষমতা, এই যে পাপের সদাব্যস্ততা, ইহা দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা পাপকে কোন বিকার না বলিয়া পুরুষভাবে কল্পনা করিয়া লইয়াছে। ঈশ্বর যেমন মনুষ্যকে অসৎ হইতে সৎপথে লইয়া যান, মারও সেইরূপ মনুষ্যকে সৎ হইতে অসৎ পথে লইয়া যাইবার জন্য সদা ব্যগ্র। সুতরাং যেমন আমরা ঈশ্বরকে পুরুষ বলিয়া নির্ণয় করি—অর্থাৎ তিনি কেবল-

মাত্র গুণ নহেন—সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা মারকে পুরুষ বলিয়া স্থির করিয়াছে,—সে কেবলমাত্র পাপ বা বিকার নহে।

পাপকে পুরুষ বলিয়া কল্পনা করিলে, সে সর্ব্বদা নিজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। ইহা কখন মানুষকে ছাড়ে না। মনে সাধু চিন্তা আসিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাপ চিন্তা আসে। বিশেষতঃ যখন কোন লোক সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইব বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হয়, ঠিক সেই সময়ে তাহার মনে সংসারে ফিরিয়া যাইবার প্রলোভনও আসে। সমুদ্রে ঝাঁপ দিবার পূর্ব্বেই কে যেন তাহাকে পশ্চাৎ হইতে ধরিতে আসে। কেবল বলে—"কেন ঝাঁপ দিতেছিস্? কেন চিরদিনের জন্য ডুবিয়া মরিবি? ফিরিয়া আয়, সুখে থাক্, কোন বিপদ তোকে আক্রমণ করিবে না।"

সিদ্ধার্থের মনে এইপ্রকার ভাব আসিয়াছিল। মহাপুরুষেরা যে কার্য্যে হাত দেন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন। সিদ্ধার্থ যদি সন্ন্যাসী না হইয়া রাজকার্য্যে মনোযোগ দিতেন, তিনি নিশ্চয়ই বুদ্ধিবলে,বাহুবলে রাজাধিরাজ হইতে পারিতেন। তাঁহার এ ক্ষমতা ছিল, ইহা তিনি জানিতেন। সেইজন্য যখন তিনি একটিকে অবজ্ঞা করিয়া অন্য আর একটিকে গ্রহণ করিবেন, তখনই তাঁহার মনে পাপচিন্তা আসিয়া তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! মার তাঁহাকে বলিল—"আমি তোকে সাতদিনের ভিতর পৃথিবীর রাজা করিয়া দিব। তুই সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিস্ না। ইহাতে ক্লেশ ভিন্ন সুখ নাই। দুই মুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করিবারও উপায় থাকিবে না। আমার আশ্রয় গ্রহণ কর, আমি তোকে পরাক্রান্ত রাজা করিয়া দিব, পৃথিবীর অনন্ত ভাণ্ডার তোর হইবে।" সিদ্ধার্থ যে অসমসাহসিক ব্রতে ব্রতী

হইয়াছিলেন তাহাতে তিনি ব্যতীত আর কাহারও মনে এই-রূপ পাপচিন্তা আসিলেই পরাস্ত করিত। কিন্তু সিদ্ধার্থ বলিলেন—"মার, দূর হইয়া যা। আমি তোর হইব না। আমি অনন্ত রাজ্যের অধিকারী হইব।" সিদ্ধার্থ মনুষ্য ছিলেন, এবং একজন অসাধারণ মনুষ্য ছিলেন। মনুষ্য বলিয়া তিনি পাপ দ্বারা আক্রান্ত হইলেন, কিন্তু অসাধারণ মনুষ্য বলিয়া তিনি তাহাকে অক্লেশে পরাজয় করিলেন।

সেই রাত্রে সিদ্ধার্থ ছয় যোজন, অর্থাৎ ২৪ ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিলেন। তিনটি রাজ্য অতিক্রম করিয়া তিনি এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে দেখেন যে, সম্মুখে অনু-বৈনেয় প্রদেশ এবং তাহার রাজধানী মৈনেয় নগর *। এই নগর অলোমা নদীর তীরে। অলোমাকে এখন কুদবানালা বলে। ইহা অন্যান্য স্রোতের সহিত মিলিয়া অবশেষে মগরা নদীতে পতিত হইয়াছে।

এই স্থানে আসিতে আসিতে সূর্য্যোদয় হইল। সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছন্দক, এ নদীর নাম কি?" ছন্দক বলিল—"অলোমা।" তখন তিনি বলিলেন—"যে মহৎ উদ্দেশ্যে আমি যাত্রা করিয়াছি সেই উদ্দেশ্যের আমি উপযুক্ত হইব।" এই বলিয়া তিনি অশ্বকে চালনা করাতে কণ্টক একলম্ফে অলোমার অপর তীরে উপস্থিত হইল। † যেস্থানে তিনি অলোমানদী পার হইয়াছিলেন সেই স্থানে এক প্রকাণ্ড স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে স্তূপ আর

---

* মৈনেয় গ্রামকে এখন তমেশ্বরনাথ বলে। এখানে অনেকগুলি স্তূপের ভগ্নাবশেষ দেখা গিয়াছে।

† কালেল সাহেব বলেন, এখনও এইস্থানের লোকেরা ইহাকে কুদবা নদী বলে, অর্থাৎ কি না যে নদীর উপরে লম্ফ দেওয়া হইয়াছিল।

নাই, তবে অসংখ্য ইষ্টকরাশি এই স্থানে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। *

অনোমা পার হইয়া তিনি প্রায় দুইক্রোশ উত্তরপূর্ব্বদিকে গমন করিলেন। তথায় এক হ্রদ ছিল। সেই হ্রদের পূর্ব্বদিকে অবস্থিতি কালে তিনি ভাবিলেন—আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি, কিন্তু এখনও আমার মস্তকে দীর্ঘকেশরাশি ও শ্মশ্রু আছে। এগুলি থাকা উচিত নহে। তাঁহার হস্তে তরবারি ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তদ্দ্বারা কেশগুলি কাটিয়া ফেলিলেন। * এই স্থলে ভক্ত বৌদ্ধেরা একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহাকে "চূড়াপ্রতিগ্রহণ স্তূপ" বলিয়া ডাকিত। তথা হইতে কিয়দ্দূর উত্তরে গিয়া তিনি দেখিলেন সেখানে কতকগুলি জম্বুবৃক্ষ রহিয়াছে। বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া তাঁহার মনে হইল যে, তিনি এখনও প্রকৃত সন্ন্যাসী হন নাই। তিনি এখনও বহুমূল্য বেশভূষায় সজ্জিত আছেন। ইতিমধ্যে সেই স্থান দিয়া এক ব্যাধ গমন করিতেছিল। তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"ভাই, আমার এই বস্ত্রের পরিবর্ত্তে তোমার ঐ কাষায় বস্ত্র আমাকে দিবে কি?" লুব্ধক বলিল—"কেন? আপনি আপনার বেশে শোভা পাইতেছেন, আমার বেশ আমাতেই শোভা পায়।" সিদ্ধার্থ বলিলেন—"আমি তোমার নিকট তোমায় বস্ত্রগুলি ভিক্ষা চাহিতেছি। আমার অনুরোধ রক্ষা কর।" ব্যাধ নিজ বস্ত্র তাঁহাকে দিয়া তাঁহার বস্ত্র গ্রহণ করিল। যে স্থানে এই ঘটনাটি হইয়াছিল, সেস্থানে এক চৈত্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহাকে "কাষায়গ্রহণ চৈত্য" বলিয়া ডাকিত। তৎপরে তাঁহার গাত্রে যত অলঙ্কার ছিল সকলই খুলিয়া তিনি

* যে হ্রদের তটে এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তাহাকে এখন "শীর্ষাও তাল" বলে এবং সেই গ্রামের নাম "শীর্ষাও"।

ছন্দকের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন—"ছন্দক, তুমি এই অলঙ্কারগুলি লইয়া কণ্টকসহ নগরে প্রত্যাগমন কর। আমি আর ফিরিতেছি না।" ছন্দক সিদ্ধার্থের নিতান্ত অনুগত ছিল। প্রভুর কথা শুনিয়া সে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল—"হে দেবপুত্র, আমিও আর গৃহে যাইব না। এই অরণ্যের মধ্যে অনেক হিংস্র জন্তু আছে। আমি আপনার সঙ্গে থাকিলে তাহাদিগের গ্রাস হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিব। অতএব আমাকে আপনার সঙ্গে থাকিতে অনুমতি দিন।" সিদ্ধার্থ বলিলেন—"তোমার সন্ন্যাস লইবার সময় এখনও আসে নাই। অতএব তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর। আমার পিতা পত্নী সকলে ভাবিত আছেন। তুমি তাঁহাদিগকে আমার বৃত্তান্ত সবিস্তার নিবেদন করিও।"

ছন্দক তথা হইতে অধোবদনে ফিরিয়া গেলেন। কপিলবস্তুতে প্রত্যাগমন করিতে তাহার সাত দিন লাগিয়াছিল। যে স্থান হইতে ছন্দক প্রত্যাবর্ত্তন করে সেই স্থানে মহারাজা অশোক এক প্রকাণ্ড স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। ইহা "ছন্দকনিবর্ত্তন স্তূপ" বলিয়া বিখ্যাত ছিল এবং সেই স্থানকে এখনও ঐ প্রদেশের লোকেরা "মহাস্থান" বলিয়া ডাকে।

ইংরাজের আতঙ্ক।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মহাজনদের দ্বারা একান্ত উৎপীড়িত হইয়া গবর্মেণ্টের নিকট নালিশ করিবার জন্য সাঁওতালগণ তাহাদের অরণ্য-আবাস ছাড়িয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। তখন ইংরাজ সাঁওতালকে ভাল করিয়া চিনিত

না;—তাহারা কি চায়, কেন বাহির হইয়াছে কিছুই বুঝিতে পারিল না। এ দিকে পথের মধ্যে পুলিস তাহাদের সহিত লাগিল—আহারও ফুরাইয়া গেল—পেটের জ্বালায় লুটপাট আরম্ভ হইল। অবশেষে গবর্মেণ্টের ফৌজ আসিয়া তাহাদিগকে দলকে-দল গুলি করিয়া ভূমিসাৎ করিতে লাগিল।

এই ঘটনার উপলক্ষ্যে হাণ্টার সাহেব বলেন—ভারতবর্ষে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ সম্প্রদায়ের সংখ্যা অল্প এবং তাহারা বহু-সংখ্যক ভিন্নজাতীয় অধিবাসীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এরূপ অব-স্থায় সামান্য সূত্রপাতেই বিপদের আশঙ্কাটা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। তখন পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধীরভাবে বিবেচনা করিবার সময় থাকে না—অতি সত্বর সবলে একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিবার প্রবৃত্তি জন্মে। যখন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্‌গণ এইরূপ কোন কারণে অকস্মাৎ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে তখনি গবর্মেণ্টের মাথা ঠাণ্ডা রাখা বিশেষরূপে আবশ্যক হয়। হাণ্টার বলেন, এইরূপ উত্তেজনার সময় ভারত গবর্ণমেণ্টকে প্রায়ই ঠাণ্ডা থাকিতে দেখা গিয়াছে।

উপরি-উক্ত সাঁওতাল-উপপ্লবে কাটাকুটির কার্য্যটা বেশ রীতিমত সমাধা করিয়া এবং বীরভূমের রাঙা মাটি সাঁওতালের রক্তে লোহিততর করিয়া দিয়া তাহার পরে ইংরাজরাজ হত-ভাগ্য বন্যদিগের দুঃখনিবেদনে কর্ণপাত করিলেন। যখন বন্দুকের আওয়াজটা বন্ধ করিয়া তাহাদের সকল কথা ভাল করিয়া শুনিলেন তখন বুঝিলেন তাহাদের প্রার্থনা অন্যায় নহে। তখন তাহাদের আবশ্যকমত আইনের সংশোধন, পুলি-শের পরিবর্ত্তন এবং যথোপযুক্ত বিচারশালার প্রতিষ্ঠা করা হইল।

কিন্তু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ সম্প্রদায়ের উষ্মা তখনও নিবারণ হইল না। বিদ্রোহীদের প্রতি নিরতিশয় নির্দ্দয় শাস্তিবিধান না করিয়া তাহারা ক্ষান্ত হইতে চাহে না। তাহারা বলিল, বিদ্রোহীরা যাহা চাহিয়াছিল সকলই যদি পাইল তবে ত তাহাদের বিদ্রোহের সার্থকতাসাধন করিয়া একপ্রকার পোষকতা করাই হইল। ক্যাল্‌কাটা-রিভিয়ুপত্রের কোন ইংরাজ লেখক এই শান্তিপ্রিয় নিরীহ সাঁওতালদিগকে বনের ব্যাঘ্র, রক্তপিপাসু বর্ব্বর প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিলেন, তাহাতে, কেবল দোষীদিগকে নহে, বিদ্রোহী জেলার অধিবাসীবর্গকে একেবারে সর্ব্বসমেত সমুদ্রপারে দ্বীপান্তরিত করিয়া দিবার জন্য গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিলেন।

মনে একবার ভয় ঢুকিলে বিচারও থাকে না, দয়াও থাকে না। আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রে আছে—শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। কেবল ভূষণ কেন, তাহা স্বাভাবিক বলিলেও নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। যেখানে মনে মনে আত্মশক্তির অভাব আশঙ্কা হয় সেখানে মানুষ, হয় অগত্যা ক্ষমা করে, নয় লেশমাত্র ক্ষমা করে না, নিষ্ঠুরভাবে অন্যকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করে। অনেক সময় হিংস্র পশু, যে, অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করে, সকলেই জানেন ভয়ই তাহার মূল কারণ, হিংস্রতা নহে।

ইংরাজ যখন কোন কারণে আমাদিগকে ভয় করে তখনি সেটা আমাদের পক্ষে বড় ভয়ের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়—তখনি ভয়ের কম্পনে দয়ামায়া সুবিচার আপাদমস্তক টলমল করিতে থাকে।

ইংরাজ হঠাৎ কন্‌গ্রেসের মূর্ত্তি দেখিয়া প্রথমটা আচম্কা ডরাইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কারণ, মানুষ চিরসংস্কারবশতঃ

স্বদেশী জুজুকে যতটা ভয় করে, বিদেশী বিভীষিকাকে ততটা নহে। এইজন্য ভারতবর্ষের সুখশয়নাগারে হঠাৎ সেই পোলিটিকাল জুজুর আবির্ভাব দেখিয়া ইংরাজের সুস্থ প্লীহাও চমকিয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু কন্‌গ্রেস্‌টার উপরে প্রত্যক্ষভাবে কোনরূপ আঘাত করা হয় নাই। তাহার কারণ, ঢাকের উপরে ঘা মারিলে ঢাক আরও বেশি করিয়া বাজিয়া উঠে। কন্‌গ্রেসের আর কোন ক্ষমতা থাক্‌ বা না থাক্‌ গলার জোর আছে, তাহার শব্দ সমুদ্রপার পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছে।

সুতরাং এই নবনির্ম্মিত জাতীয় জয়ঢাকটার উপরে কাঠি না মারিয়া তলে তলে তাহাকে ছিদ্র করিবার আয়োজন করা হইল। মুসলমানেরা প্রথমে কন্‌গ্রেসে যোগ দিবার উপক্রম করিয়া সহসা যে, বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল তাহার কারণ বোঝা নিতান্ত কঠিন নহে—এবং পাঠকদের নিকট সে কারণ স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করা অনাবশ্যক বোধ করি।

কিন্তু এতদিনে ইংরাজ এ কথা কতকটা বুঝিয়া থাকিবে যে, হিন্দুর হস্তে পলিটিক্স্‌ তেমন মারাত্মক নহে। আবহমান কালের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও ভারতবর্ষে পোলিটিকাল ঐক্যের কোন লক্ষণ কোন কালে দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐক্য কাহাকে বলে মুসলমান তাহা জানে এবং পলিটিক্স্‌ও তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ নহে;—মুসলমান যদি দূরে থাকে তবে কন্‌গ্রেস্‌ হইতে আশু আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

হিন্দুজাতির প্রতি পলিটিক্সের প্রভাব যে, তেমন প্রবল নহে কন্‌গ্রেসই তাহার প্রমাণস্থল হইবার উপক্রম করিতেছে। যতই দিন যাইতেছে ততই কন্‌গ্রেস্‌ অর্থাভাবে দরিদ্র এবং উৎসাহা-

ভাবে দুর্ব্বলের মত প্রতিভাত হইতেছে। ইংরাজও সম্প্রতি কিছু যেন নিশ্চিন্ত বোধ করিতেছে!

কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরাজের ভারতশাসনক্ষেত্রে আর একটা নূতন ভয় আসিয়া দেখা দিয়াছে। সেটা আর কিছু নয়, গোরক্ষণী সভা। যাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এই সভাটা স্থাপন করা হইয়াছে তাহারা যতটা নিরীহ, সভাটাকে ততটা নিরীহ বলিয়া ইংরাজের ধারণা হইল না।

কারণ, ইংরাজ ইহা বুঝিয়াছে, যে, স্বদেশ ও স্বজাতি রক্ষার জন্য যে হিন্দু এক হইতে পারে না, গোষ্ঠ এবং গোজাতিরক্ষার জন্য চাই কি তাহারা এক হইতেও পারে। স্বাধীনতা, স্বদেশ, আত্মসম্মান, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি অনেক শ্রেষ্ঠতর পদার্থের অপেক্ষা গোরুকে রক্ষা করা যে, আমাদের পরমতর কর্ত্তব্য এ কথা হিন্দু ভূপতি হইতে কৃষক পর্য্যন্ত সকলেই সহজে বুঝিবে। গোহত্যা নিবারণ সম্বন্ধে নেপালের গুর্খা হইতে পঞ্জাবের শিখ পর্য্যন্ত এক-মত।

এই কারণে গোরক্ষণী-সভাটা ইংরাজের পক্ষে কিছু বিশেষ আতঙ্কজনক হইতে পারে। ফলেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু প্রমাণ দেওয়া কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি ভ্রমণ উপলক্ষে পশ্চিম-ভারতে গিয়া দেখিয়াছি, গোরক্ষার জন্য লোকে আর ততটা ব্যস্ত নহে——এখন গোরক্ষকগণ রক্ষা পাইলে হয়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সকলে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে বটে, তবু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেছে না। যে সকল কথা ঘরে ঘরে আলোচিত হইতেছে সে সকল কথা যদি প্রকাশ হইত—তবে কি হইত? যে প্রকাশ করিত তাহাকে

সম্ভবতঃ নির্দ্দিষ্ট রাজ-অট্টালিকায় রাজপ্রহরীগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া বাস করিতে হইত। গোরুও সময়ে সময়ে সকরুণ হম্বারব করে, বাঙ্গালীও সময়ে সময়ে দেশী বিদেশী ভাষায় আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে—কিন্তু পশ্চিম-ভারত একেবারে মূক।

তবে বাহির হইতে একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। গাজিপুরের জজ্ ফক্স্ সাহেব ন্যায়পরায়ণ বলিয়া সাধারণের নিকট সুবিদিত। গোহত্যা সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার আপীল হাই-কোর্ট তাঁহার নিকট হইতে তুলিয়া লইয়াছে।

ফক্স্ সাহেব হিন্দু নহেন; গোজাতি এবং গোবৎসসজাতির প্রতি তাঁহার বিশেষ পক্ষপাত থাকিবার কোন কারণ দেখা যায় না। গোসম্প্রদায়ের প্রতি যদি তাঁহার কোন পক্ষপাত থাকে সেও কেবল খাদকভাবে।

দ্বিতীয়তঃ, এই গোহত্যা সম্বন্ধীয় দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রতি গবর্ণমেণ্টের তীব্র দৃষ্টি রহিয়াছে, এবং অ্যাংলোইণ্ডিয়ান্‌গণও বিশেষ ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন—এমন কি, বিলাতের স্পেক্টেটর পত্রও এইরূপ উপদ্রবগুলিকে সতেজে দমন, সবলে দলন করিয়া ফেলিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এরূপ স্থলে অন্যান্য সাধারণ মকদ্দমার অপেক্ষা এরূপ মকদ্দমা ইংরাজ বিচারক বিশেষ সতর্কভাবেই বিচার করিয়া থাকেন।

এমন অবস্থাতেও যদি গবর্ণমেণ্ট ফক্স্ সাহেবের বিচারে সন্তুষ্ট না হন, তবে ত তাঁহার হাতে সামান্য সশা-চুরির মকদ্দমাও রাখা উচিত হয় না।

এই সকল লক্ষণ দেখিয়াই মনে হইতেছে গবর্ণমেণ্ট কিছু বেশি ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা ভয় পাইলেই আমাদের সর্ব্বনাশ।

কিন্তু ভয় করিতে আরম্ভ করিলে কোথাও নিশ্চিন্ত হইবার যো নাই। ভারতবর্ষকে শিক্ষা দিয়াও ভয় হয়, আবার মূর্খ করিয়া রাখিলেও ভয় আছে।

ইংরাজি শিখিয়া আমরা আত্মদুঃখ নিবেদন করিতে শিখি, এবং সাধারণ অভাবমোচনের উপলক্ষে সাধারণের মধ্যে ঐক্য-বন্ধনের সূত্রপাত হয়। আবার যেখানে ইংরাজি শিক্ষা নাই সেখানে যে, কোন্ অন্ধ সংস্কারের কৃষ্ণবর্ণ বারুদে কোন্‌খান হইতে কণামাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লাগিয়া অকস্মাৎ একটা প্রলয় দিগ্‌দাহ উপস্থিত করে তাহা বলা যায় না।

কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ভয়টা দেখিতে ভাল নহে। কড়া শাসন, অর্থাৎ যখন বিচারপ্রণালীর মধ্যে ন্যায় অপেক্ষা বলের প্রয়োগ বেশী দেখা যায় এবং যখন চতুর্দ্দিক হইতে খোঁচাখোঁচি লাগাইয়া তাড়াতাড়ি দেশের লোককে ভয় পাওয়াইয়া দিবার চেষ্টা দেখিতে পাই তখনই বুঝিতে পারি গবর্ণমেণ্টের হৃৎস্পন্দন কিছু অযথা বাড়িয়া উঠিয়াছে। সেরূপ উগ্রতায় গবর্ণমেণ্টের বলিষ্ঠতা প্রকাশ পায় না, কেবল ভয় প্রকাশ হয় মাত্র।

মণিপুরেই গবর্ণমেণ্টের নিজবুদ্ধিদোষে বিভ্রাট ঘটুক্ আর ভারতের অন্যত্রই হিন্দু মুসলমানের অন্ধ আক্রোশবশতঃ ভ্রাতৃ-বিরোধের সূত্রপাত হউক্, গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত, শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা এবং অবিচলিত অপক্ষপাত এবং প্রশান্ত ন্যায়পরতা।

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বলিতে যে কাহাকে বুঝায় আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। এই হিন্দু মুসলমান বিপ্লবে বড়কর্ত্তা ল্যান্স্-ডোন্, মেজকর্ত্তা ক্রস্‌থোয়েট্ এবং জেলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছোটকর্ত্তা-গুলি সকলেই এক পলিসি অবলম্বন করিয়া একভাবে কাজ

করিতেছেন কি না জানি না। সার ওয়েডারবর্ণ লিখিয়াছেন এই সমস্ত উপদ্রবে গবর্ণমেণ্টের কিছু হাত আছে——ল্যান্স্ডাউন্ বলেন এমন কথা যে বলে সে অত্যন্ত দুষ্ট। আমরা ইহার একটা সামঞ্জস্য করিয়া লই।

আমরা বলি, গবর্মেণ্টের পলিসি যেমনই থাক্, ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ গবর্ণমেণ্টের যন্ত্র নহে, তাহারা মানুষ। আপন অধিকারের মধ্যে তাহাদের বিরাগ অনুরাগ মতামত খাটাইবার যথেষ্ট অবসর আছে। কন্গ্রেস্ এবং শিক্ষিত বাবুদের আচরণে তাহাদের যদি এমন ধারণা হয় যে, হিন্দু মুসলমানদিগকে পৃথক করিয়া রাখা আবশ্যক, তবে তাহারা ছোট বড় এত উপায় অবলম্বন করিয়া বিদ্বেষবীজ বপন করিতে পারে যে, গবর্ণমেণ্টের পরম উদার সদভিসন্ধি তাহার নিকট হার মানে।

গবর্ণমেণ্টের আইন কাহাকেও ঘৃণা করে না, ভয় করে না, পক্ষপাত করে না, কিন্তু ইংরাজ করে। পায়োনিয়র ইংলিশম্যান প্রভৃতি ইংরাজি কাগজগুলা যখন কন্গ্রেসের প্রতি চক্ষু রক্তবর্ণ করে এবং বাবুদের প্রতি সরোষ অবজ্ঞাবর্ষণের চেষ্টা করে, তখন ইংরাজ জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেটগণ যে, অবিচলিতচিত্তে থাকে তাহা নহে। এই সমস্ত বিদ্বেষভাব সর্ব্বসাধারণ ইংরাজের মধ্যে প্রতিদিন ব্যাপ্ত ও বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে এবং যাহার হাতে কোনো ক্ষমতা আছে সে যে নানা উপায়ে কার্য্যতঃ সেই ভাবকে প্রকাশ করে এবং একটা গোপন পলিসি অবলম্বন করিয়া কন্গ্রেস্ প্রভৃতিকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ সম্প্রতি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে ইহা গবর্ণমেণ্টের পলিসি-সম্মত না হইতে পারে কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অন্তর্গত বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইংরাজ বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

ফুৎকারে যে, এই অগ্নিকাণ্ডের সূচনা করিয়া দিয়াছে আমাদের দেশের লোকের এইরূপ বিশ্বাস। তুলার বস্তার মধ্যে আগুন ফেলিয়া যখন সমস্তটা ধরিয়া উঠিবার উপক্রম হইল তখন প্রবল পদাঘাতের দ্বারা সেটা নির্ব্বাণ করা হইতেছে; তুলা বেচারি একে ত পুড়িল, তাহার পরে লাথিটাও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাইতে হইল।

কেবল, ইংরাজের মনে অকস্মাৎ একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত ব্যাপারগুলি ঘটিতেছে।

নিরুদ্দেশ যাত্রা।

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরি?
বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী?
যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাস শুধু, মধুরহাসিনী,
বুঝিতে না পারি, কি জানি কি আছে
তোমার মনে?
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি'
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি',
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন
গগন-কোণে।
কি আছে হোথায়—চলেছি কিসের
অন্বেষণে?

বল দেখি মোরে শুধাই তোমায়,
অপরিচিতা,—
ওই যেথা জলে সন্ধ্যার কূলে
দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্‌বধূ যেন ছলছল আঁখি
অশ্রুজলে,
হোথায় কি আছে আলয় তোমার
উর্ম্মিমুখর সাগরের পার,
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির
চরণতলে ?
তুমি হাস শুধু মুখপানে চেয়ে
কথা না বলে' !

হুহু করে বায়ু ফেলিছে সতত
দীর্ঘশ্বাস !
অন্ধ আবেগে করে গর্জ্জন
জলোচ্ছ্বাস !
সংশয়ময় ঘননীল নীর,
কোন দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া
দুলিছে যেন ;
তারি পরে ভাসে তরণী হিরণ,
তারি পরে পড়ে সন্ধ্যা-কিরণ,

তারি মাঝে বসি এ নীরব হাসি
 হাসিছ কেন ?
আমি ত বুঝি না কি লাগি তোমার
 বিলাস হেন ?

যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি
 "কে যাবে সাথে ?"
চাহিনু বারেক তোমার নয়নে
 নবীন প্রাতে।
দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিম পানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন
 কাঁপিছে জলে।
তরীতে উঠিয়া শুধানু তখন
আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়
 সোনার ফলে ?
মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল
 কথা না বলে' !

তারপরে কভু উঠিয়াছে মেঘ,
 কখনো রবি,
কখনো ক্ষুব্ধ সাগর, কখনো
 শান্ত ছবি।
বেলা বহে' যায়, পালে লাগে বায়,
সোনার তরণী কোথা চলে' যায়,

পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন
অস্তাচলে!
এখন বারেক শুধাই তোমায়
স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়,
আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি
তিমির-তলে?
হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন
কথা না বলে'!

আঁধার রজনী আসিবে এখনি
মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক
পড়িবে ঢাকা।
শুধু ভাসে তব দেহ-সৌরভ,
শুধু কানে আসে জল-কলরব,
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে, তব
কেশের রাশি।
বিকল হৃদয় বিবশ শরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর—
"কোথা আছ ওগো করহ পরশ
নিকটে আসি!"
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না
নীরব হাসি!

———

সাংখ্যদর্শন।

১৬॥ চৈতন্য ও জ্ঞান॥

সাংখ্যদর্শনে "চৈতন্য" ও "জ্ঞান" এই দুইটি শব্দেরই বহুল পরিমাণে ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে ভেদ কি তাহা বড় পরিষ্কার নহে। তত্রাচ অনুধাবন করিয়া দেখিলে যেন ভেদ আছে বোধ হয়।

সাংখ্যেরা বলেন, আমরা নিজ নিজ দৃষ্টান্তে প্রকৃতি ও পুরুষকে পরস্পর সম্বন্ধবিশেষে সংযত দেখি; কিন্তু এই সম্বন্ধবিশেষ নিত্য নহে। ইহার উচ্ছেদ সম্ভব এবং তাঁহাদের শাস্ত্রে তদুচ্ছেদের উপায় নির্ণীত হইয়াছে। যাহা কপিলসূত্র বলিয়া পরিগণিত তাহার শেষ সূত্র এই যে,

যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ। ৬—৭০।

যেন-তেন প্রকারেণ প্রকৃতিপুরুষের সংযোগসম্বন্ধের উচ্ছেদ-সাধন করাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আত্মা প্রকৃতির সহিত অসংযত হইয়া থাকিতে সক্ষম। তদবস্থায় আত্মার স্বভাব কি? সাংখ্যেরা বলেন, "চৈতন্যই তদবস্থায় আত্মার স্বভাব।" আর সচরাচর যাহাকে "জ্ঞান" বলা যায়— কোনও কোনও সাংখ্য পণ্ডিত তাহাকে এমন কি প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করেন। তাহাতে "জ্ঞান" প্রকৃতির কার্য্য হউক্ বা না হউক্, অন্ততঃ প্রকৃতিপুরুষের সংযোগজন্য বটে; আর যাহা "চৈতন্য" বলিয়া অভিহিত তাহা প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ-জন্য নহে।

এই "চৈতন্য"নামক পদার্থ প্রকৃতিতে আদৌ নাই, তজ্জন্য প্রকৃতিকে "অচেতন" বলা যায়। কপিলের এক সূত্র এই—

"ন ভূত 'চৈতন্যং' প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ সাংহত্যেঽপিচ।" ৫—১২৯

—অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থ বিযুক্ত হইয়াই থাকুক্ বা সংযুক্ত হইয়াই থাকুক্, তাহাতে "চৈতন্য" নাই। কেহ কেহ চৈতন্য ও জ্ঞানকে সমানার্থক বলিয়া বুঝেন। তবে উপরোক্ত ভেদ জ্ঞাপনের জন্য "বিশুদ্ধ চৈতন্য" ও "বিকৃত চৈতন্য" এইরূপে চৈতন্যের ভিন্নাবস্থা স্বীকার করেন। তদ্রূপ জ্ঞানকে সাধারণ জ্ঞান ও কেবল জ্ঞান বা "কৈবল্য" বলিয়া বিভক্ত করেন। এইরূপ বিভাগ সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। যদি জ্ঞান ও চৈতন্যের বাস্তবিক ভেদ কিম্বা ভিন্নাবস্থা থাকে, তবে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করাই যুক্তিসিদ্ধ।

বোধ হয়, চৈতন্য ও জ্ঞানের এইরূপ লক্ষণ করিলে সাংখ্যদর্শনের মূলতত্ত্ব স্পষ্টীকৃত হইতে পারে, যথা;—

(১) চৈতন্য=আত্মার স্বকীয় সত্তা ও অবস্থার অনুভব॥

(২) জ্ঞান=ভৌতিক পদার্থ দ্বারা আত্মার অবস্থান্তর॥

চৈতন্য আত্মার নিত্যসহচর। চৈতন্য দ্বারা বিযুক্ত হইয়া আত্মা কোন কালেই থাকে না। চৈতন্যের লোপে আত্মার বিলোপ। আত্মা যেমন নিত্য, চৈতন্যও তেমনি নিত্য। চৈতন্য আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। আত্মা সকল সময়েই স্বকীয় সত্ত্বার ও অবস্থার অনুভব করিয়া থাকে। আমি আছি, আমার এক্ষণে অবস্থা এইরূপ—ঈদৃশ অনুভবকে চৈতন্য বলা যায়।

পক্ষান্তরে "জ্ঞান" আত্মার নিত্যসহচর নহে। সুষুপ্তি অবস্থায় জ্ঞান থাকে না। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় অসংখ্য জ্ঞানের আবির্ভাব তিরোভাব হইতে থাকে। যখন জ্ঞান হয় তখন আমার ঈদৃশ জ্ঞান হইতেছে বলিয়া "চৈতন্য" থাকে; আবার একপ্রকার জ্ঞান অন্তর্হিত হইলে ও ভিন্নপ্রকার জ্ঞান সমুদ্ভূত হইলে, সেই

আবির্ভাব তিরোভাবেরও "চৈতন্য" হয়। অতএব "চৈতন্য" যেমন নিত্য"জ্ঞান" তেমনি ক্ষণিক।

সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মার চৈতন্য থাকে ইহা সাংখ্যদের একটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য কথা। তাঁহারা বলেন;—

"সমাধি-সুষুপ্তি-মোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা।" ৫—১১৬

—আত্মা সমাধি অবস্থায়, সুষুপ্তি অবস্থায় এবং মোক্ষ অবস্থায় "ব্রহ্মত্ব" * প্রাপ্ত হয়। সমাধি অর্থাৎ ধ্যান; ধ্যানের লক্ষণ;—

"ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ।" ৬—২৫

—যে জাগ্রদবস্থায় মনের বিষয়স্বরূপ কোনও জ্ঞান থাকে না— তাহার নাম ধ্যান। আর যে অবস্থায় কোন কারণেই আত্মার কোনও প্রকার দুঃখ উৎপন্ন হয় না—তাহার নাম মোক্ষ।

মোক্ষ ও ধ্যান সম্ভব কি না, তাহা এস্থলে বিবেচ্য নহে। পরে তাহার আলোচনা করিব। কিন্তু সুষুপ্তি কি, তাহা আমরা সকলেই জানি। গভীর নিদ্রার নাম সুষুপ্তি। যে নিদ্রাবস্থায় কোনও প্রকার স্বপ্নদর্শন হয় না তাহার নাম সুষুপ্তি। তৎকালে প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ কিয়ৎকালের জন্য বিচ্ছিন্ন বা বিনষ্ট না হইয়াও অবষ্টব্ধ ও অবরুদ্ধ হয়। প্রকৃতি পুরুষের কোনও অবস্থান্তর সাধন করে না; প্রকৃতির পুরুষের উপর ক্রিয়াকারিতা বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। আত্মা তৎকালে স্বীয় সত্তা ও অবস্থার যেরূপ অনুভব করে, জাগ্রৎ অবস্থায় তাহার কিছুমাত্র স্মৃতি থাকে না। কেন না, স্মৃতি একপ্রকার সক্রিয় প্রকৃতিসংযোগজন্য জ্ঞান; সুতরাং প্রকৃতির বৃত্তিনিরোধ অবস্থায় চৈতন্যের স্মৃতি অসম্ভব। †

* অর্থাৎ শরীরের অধিষ্ঠাতাস্বরূপ শরীরকে জীবিত রাখিয়াও তদ্দারা অভিভূত হয় না।

† জাগ্রদবস্থায় জ্ঞান স্মৃতির সম্বাধশতঃ অহঙ্কারসমন্বিত—সুষুপ্তি অবস্থায়

সুষুপ্তির পর লোকে অনুভব করে—"আমি অতিসুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম।" ইহাতে যে নিদ্রাবস্থার কোনও প্রকার সুখের চৈতন্যের স্মৃতি হয় তাহা বলা যায় না। ইহাতে কেবল দুঃখাভাব প্রকাশ করে। গভীর নিদ্রায় আমার সকল দুঃখজনক জ্ঞানের এবং সকল দুঃখের অবসান হইয়াছিল ইহাই বক্তব্য। সুষুপ্তি অবস্থায় চৈতন্যকে জ্ঞানাভাব ও দুঃখাভাবের চৈতন্য বলা যায়; কিন্তু সেই চৈতন্য কোনও ভাবপদার্থের চৈতন্য কি না, তাহা নিশ্চয় করা যায় না। ফলতঃ সুষুপ্তিতত্ত্বটি পণ্ডিতগণের সবিশেষ আলোচনার উপযুক্ত।

চৈতন্য থাকিলেও জ্ঞান থাকে না দেখা গেল। কিন্তু চৈতন্য ব্যতিরেকে জ্ঞান অসম্ভব। জ্ঞানের ন্যায় সুখদুঃখও চৈতন্য ব্যতিরেকে অসম্ভব। যখন সুখ ও দুঃখের উদয় হয়—তখন আত্মা তত্তদবস্থাপন্ন হইল বলিয়া চৈতন্য বা অনুভব জন্মে। তাদৃশ অনুভব যখন অসম্ভব তখন সুখদুঃখও অসম্ভব।

তদ্রূপ রাগদ্বেষাদি এবং ইচ্ছাশক্তির স্ফূর্ত্তিসমকালেও তাহাদের মূলে আত্মার চৈতন্যের সদ্ভাব দেখা যায়।

চৈতন্যের আর এক নাম "বোধ"। চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া সাংখ্যেরা আত্মাকে "বুদ্ধ" এই সংজ্ঞা প্রদান করেন। এবং আত্মাকে—

নিত্যবুদ্ধস্বভাব

বা

নিত্যচৈতন্যময়

বলিয়া বর্ণনা করেন। কপিলসূত্র ১—১৯॥

চৈতন্যে স্মৃতি না থাকায় তাহাতে অহঙ্কারের লেশ থাকে না। তজ্জন্য সাংখ্যেরা আমি আমার ইত্যাদি অভিমানকে চৈতন্যের অঙ্গ বলিয়া মনে করেন না।

১৭॥ সুখ ও আনন্দ ॥

জ্ঞান ও চৈতন্যের যে প্রভেদ, সুখ ও আনন্দের মধ্যেও সেই প্রভেদ। যে সুখের বিচ্ছেদ নাই তাহার নাম আনন্দ। তাহা অবিচ্ছিন্ন, সন্তত ও চিরাভ্যস্ত বলিয়া বিশেষ প্রণিধান ব্যতিরেকে অনুভূত হয় না। পক্ষান্তরে—প্রকৃতিসংযোগজন্য রূপরসাদির অনুভবে সুখের উৎপত্তি। সুখের আবির্ভাব তিরোভাব আছে। আনন্দ চৈতন্যের সহচর; তাহা নিত্য, তাহার আবির্ভাব তিরোভাব নাই। আত্মা যেমন স্বীয় অস্তিত্ব ও অবস্থা সর্ব্বদা অনুভব করে, তেমনি সেই অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে একটি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি বা মধুরভাবের অনুভব করে। আত্মার স্বীয় অস্তিত্বানুভব সর্ব্বদাই মধুর ভাবময়; সেই মধুরভাবের নামই আনন্দ। যখন মৃত্যু বা আত্মার সম্ভাবিত বিনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হয়—তখন সেই মধুরভাব বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও মনুষ্য মরিতে চাহে না—কেন না, তৎকালেও স্বীয় সত্বানুভবের সঙ্গে একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দপ্রবাহ বিদ্যমান এবং মরিলে পাছে সেই অস্তিত্ব একবারে দীপশিখার ন্যায় নির্ব্বাণ হইয়া যায় এবং তৎসহকৃত আনন্দের বিলোপ হয়—তজ্জন্যই মরণের ভয়। মরিলেও আত্মার অস্তিত্ব থাকিবে এরূপ স্থির বিশ্বাস জন্মিলে মনুষ্যের মরণের ভয় ঘুচিয়া যায়। *

তজ্জন্য আত্মা যেমন চৈতন্যময় বা চিন্ময়—তদ্রূপ কেহ কেহ আত্মাকে "আনন্দময়" বলেন। কিন্তু এই মত সাংখ্যদর্শন-

---

* পক্ষান্তরে যাহা সুখ ও দুঃখ তাহা ভৌতিক পদার্থের ক্রিয়াজনিত জ্ঞানের ফলাফল। আনন্দপ্রবাহ অখণ্ডিত; কিন্তু সুখদুঃখ জ্ঞানের ন্যায় ক্ষণিক এবং আবির্ভাবতিরোভাবস্বভাব। জ্ঞান যেরূপ প্রকৃতিপুরুষের সংযোগজন্য, সুখদুঃখও তদ্রূপ তাদৃশ সংযোগজন্য। উহা আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম নহে।

সম্মত নহে। সাংখ্যেরা বলেন, আত্মা স্বভাবতঃ উদাসীন ;—সুখ দুঃখ যে, কেবল আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম নহে তাহাই নয়—প্রকৃতিসংযোগেও আত্মা বাস্তবিক সুখদুঃখ অনুভব করে না—কেবল সুখদুঃখের ছায়ামাত্র আত্মায় নিপতিত হইয়া আত্মার সুখ ও দুঃখের ভ্রম জন্মায়। যেমন স্ফটিকের নিকট জবাকুসুম থাকিলে স্বচ্ছ স্ফটিকও লোহিত বর্ণ দেখায়, তদ্রূপ প্রকৃতিগত সুখ-দুঃখের ছায়া আত্মাকে কিছুকালের জন্য রঞ্জিত করে মাত্র। ইহা ত গেল সুখদুঃখের কথা, তদ্ভিন্ন "আনন্দ"ও আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম নহে—কেন না, (কপিল বলেন)—

"ন একস্য আনন্দচিদ্রূপত্বে ; দ্বয়োর্ভেদাৎ। ৫—৬৬

টীকাকার বলেন—

"একধর্ম্মিণঃ আনন্দচৈতন্যোভয়রূপত্বং ন ভবতি। দুঃখজ্ঞানকালে সুখানুভবেন সুখজ্ঞানয়োর্ভেদাৎ ইত্যর্থঃ।"

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মযুক্ত একই আত্মা নামক পদার্থের "আনন্দ" ও "চৈতন্য" দ্বিবিধ ধর্ম্ম এ কথা অঙ্গীকার করা যায় না। কেন না, দুঃখজ্ঞানকালে সুখের * অনুভব হয় না। অতএব যখন আনন্দের বিচ্ছেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ তখন আনন্দকে আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম বলা যায় না ; যে হেতু স্বাভাবিক ধর্ম্মের কখনই অপায় বা বিনাশ নাই।

এস্থলে কোন্ মত আদরণীয় ও কোন্ মত উপেক্ষণীয় তাহা বিচক্ষণ পাঠকেরা মীমাংসা করিবেন। আত্মদৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে ইহার মীমাংসা সম্ভব নহে। মীমাংসাস্থলে প্রশ্ন এই—দুঃখানুভবের সময়ে আনন্দানুভবের একেবারে অভাব হয় কি না ? মীমাংসকের অনুভব যাদৃশ তিনি তেমনি মীমাংসা করিবেন।

---

* এখানে "সুখ" ও "আনন্দে"র ভেদ উপেক্ষিত হইয়াছে।

সাংখ্যের বিরুদ্ধ পক্ষে বলা যায় যে, বিমিশ্র দুঃখ কেহই কোন-কালে অনুভব করে না। সুখ ও আনন্দের ভেদ স্মরণ রাখিয়া বলা যাইতে পারে যে, ঘোরতর যন্ত্রণার মধ্যেও মনুষ্য আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। এ কথা ঠিক কি না, তাহা অনুভব-সাপেক্ষ। যদি লেখকের অভিপ্রায় জানিতে পাঠকের কৌতূহল হয়—তবে বলিতে পারি যে,এস্থলে সাংখ্যের সহিত আমার মতের ঐক্য নাই। আমার বিবেচনায় জীবনের প্রশান্ত আনন্দ-প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন। আত্মা স্বীয় স্বাধীন সত্বা অনুভবকালে সর্ব্বদাই আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। যাঁহারা আত্মাকে "সচ্চিদানন্দ" বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের সূক্ষ্মদর্শিতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

ফলতঃ কপিলশিষ্যগণের অন্যান্য অনেক গুণ থাকিলেও—তাঁহারা যে, সংসারকে বিষনয়নে দেখিতেন এটি তাঁহাদের একটি দোষ না বলিয়া থাকা যায় না। সুখদুঃখময় সংসারে তাঁহারা সুখের প্রতি একবারে অবজ্ঞাপরবশ হইয়া দুঃখের প্রতীকারের জন্য যেরূপ যত্নবান হইয়াছিলেন—সুখের উপচয়ের জন্য তাদৃশ যত্ন করেন নাই। তাঁহারা বলিতেন—

"যথা দুঃখাৎ ক্লেশঃ পুরুষস্য ন তথা সুখাদভিলাষঃ।" ৬-৬

"কুত্রাপি কোঽপি সুখী ইতি।" ৬-৭

"তদপি দুঃখশবলমিতি দুঃখপক্ষে নিঃক্ষিপন্তে বিবেচকাঃ।" ৬-৮

অর্থাৎ—দুঃখ হইতে মনুষ্যের যেরূপ ক্লেশ সমুদ্ভূত হয়—সুখ হইতে ভোগবাঞ্ছা তাদৃশ সমুদ্ভূত হয় না। সংসারে লক্ষের মধ্যে একজনকে সুখী দেখিতে পাইবে। এবং সে স্থলেও সুখকে দুঃখমিশ্রিত দেখিবে। অতএব তাদৃশ দুঃখজড়িত সুখকেও বিবেচক লোকে দুঃখের পাল্লাতেই নিক্ষেপ করেন। এরূপ অবস্থায় সংসারে সুখ নাই বলিলেই হয়। যদি বল—

"সুখলাভাভাবাৎ অপুরুষার্থত্বম্ ইতি চেৎ?"

—যদি তোমার শাস্ত্র অনুশীলনে সুখোৎপত্তি না হয় তবে তাহা নিরর্থক—

উত্তর— "ন—দ্বৈবিধ্যাৎ।"—

তাহা বলিতে পার না—কেন না, মনুষ্য যেমন সুখলাভ ইচ্ছা করে, দুঃখবিনাশও তেমনি ইচ্ছা করে;—এই শাস্ত্র অনুশীলনে যদি সুখলাভের আশা না থাকে, অন্ততঃ দুঃখনাশ হইবে। যদি কেবল দুঃখনাশের উপায় উদ্ভাবনের জন্য জীবন উৎসর্গ না করিয়া সুখলাভ ও সুখবৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবনের জন্যও কপিলশিষ্যেরা যত্নবান হইতেন—তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা সংসারের অধিকতর উপকার সংসাধিত হইতে পারিত। সাংখ্য-শাস্ত্রের মোক্ষতত্ত্ব আলোচনাকালে এই কথা পুনরায় আসিবে।

১৮ ॥ দেশ ও কাল ॥

সাংখ্যেরা সমুদায় পদার্থকে ব্যক্ত অব্যক্ত ও জ্ঞ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে চাহেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—দেশ ও কাল উক্ত তিনের কোন শ্রেণীর অন্তর্গত?

এই বিষয়ে সাংখ্যশাস্ত্রের মতের কিছু অসংলগ্নতা দৃষ্ট হয়।

প্রথমতঃ "দেশ" কাহাকে বলে? দেশ, দিক্, ব্যোম ও আকাশে কিছু ভেদ আছে কি? অনেকে ব্যোম ও আকাশকে Ether বলিয়া ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। কিন্তু ইংরাজী বিজ্ঞানের "ঈথর" নামক অতীন্দ্রিয় পদার্থ যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা স্বীকার করিতেন তাহা আমার জানা নাই। আকাশকে শব্দের কারণ বলিয়া প্রাচীনেরা অনুমান করিতেন;

উত্তাপ বা জ্যোতির কারণ বলিয়া অনুমান করিতেন না। সুতরাং প্রাচীনদের আকাশ বা ব্যোমের সহিত ঈথরের কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। আমার বিবেচনায় প্রাচীনেরা এতদ্দেশে ব্যোম আকাশ দিক্ দেশ ইত্যাদি শব্দে মূলে একই পদার্থ বুঝিতেন। দৈর্ঘ্য বিস্তার ও বেধ যে পদার্থের আকার তাহাকে অসীম বলিয়া মনে করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহারই নাম আকাশ। দেশাদি তাহারই নামান্তরমাত্র। ইংরাজিতে ইহাকে Space বলে।

প্রথমতঃ দেখা যায় আকাশকে পঞ্চভূতের মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। তাহা হইলে তাহা জ্ঞানের বিকারমাত্র। তাহা "ব্যক্ত"শ্রেণীর অন্তর্গত হয়। তাহাকে স্বতন্ত্র বা নিত্যপদার্থ বলা যায় না।

বাস্তবিকই কপিলসূত্রের ৫-৭২ সূত্রের ভূমিকায় টীকাকার লেখেন—

"মনঃ কালাদীনাং নিত্যত্বং প্রতিষেধতি।"

—এখানে আদি শব্দে আকাশ বা দেশ বুঝিতে হইবে। টীকাকারের মতে দেশ ও কাল নিত্য নহে, এই কথা প্রতিপাদন করণার্থেই উক্ত সূত্র রচিত। সূত্রটি এই ;—

"প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বম্ অনিত্যম্।"

দেশ ও কাল প্রকৃতির মধ্যেও পড়ে না—পুরুষের মধ্যেও পড়ে না; সুতরাং উভয়েই অনিত্য। টীকাকার আরো ব্যাখ্যা করেন যে, প্রকৃতির যে গুণ থাকাতে আত্মার "আকাশ" জ্ঞান হয়—সেই কারণ অবস্থাপন্ন আকাশ প্রকৃতির সহিত অভিন্ন ও নিত্য হইলেও যে আকাশ "ব্যক্ত" তাহা স্পষ্টই অনিত্য।

কিন্তু স্থানান্তরে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত মত দেখা যায়।

আত্মার দুঃখের কারণ কি ইহার বিচারস্থলে কেহ কেহ বলেন যে, দেশ ও কালের সহিত আত্মার সংযোগ সংসাধিত হওয়ায় আত্মা দুঃখ অনুভব করে। কপিল এই মতের খণ্ডনাভিপ্রায়ে বলেন ;—

"ন কালযোগত :—
"ব্যাপিনো নিত্যস্য সর্ব্বসংবন্ধাৎ।" ১—১২।
"ন দেশযোগতোঽপি অস্মাৎ।" ১-১৩।

দেশ ও কাল ব্যাপী (Infinite) এবং নিত্য (Eternal)। বদ্ধ অবস্থাতেও আত্মার সহিত ইহাদের যে সম্পর্ক, মুক্ত অবস্থাতেও সেই সম্পর্ক। দেশ ও কালের সহিত বিমুক্ত হইয়া আত্মা অবস্থান করে না। সুতরাং আত্মাকে স্বভাবতঃ বদ্ধ বলিয়া এবং তাহার দুঃখের পরিহার অশক্য বলিয়া স্বীকার না করিলে দেশ ও কালকে দুঃখের কারণ বলা যায় না। এখানে স্পষ্টাক্ষরে দেশ ও কালকে নিত্য পদার্থ বলিয়া অঙ্গীকার করা হইয়াছে।

আমাদের এই বিরোধের মীমাংসা করিবার চেষ্টার আবশ্যক নাই। বাস্তবিক দেশ ও কাল যদি নিত্য হয় তবে তাহারা কি পদার্থ তাহা বুঝিবার যত্ন করা যাউক্।

দেশ ও কাল বদ্ধই হউক্ মুক্তই হউক্, যদি সমুদায় পুরুষের সহিত সকল অবস্থায় সম্বদ্ধ হয়—তবে সাংখ্যমতে তাহা প্রাকৃতিক পদার্থ নহে। এ দিকে তাহারা যদি নিত্য হয়—তবে তাহারা হয় স্বাধীন পদার্থ, না হয় আত্মার অঙ্গভূত। তাহাদিগকে স্বাধীন পদার্থ বলিয়া সাংখ্যেরা অঙ্গীকার করেন নাই ; সুতরাং তাহাদিগকে আত্মার অঙ্গ বলিতে হইবে। এরূপ স্থলে আত্মার সর্ব্বপ্রকার অনুভবই দেশ ও কালের আকার প্রাপ্ত হইবে এবং দেশ ও কালের নিয়মে নিয়মিত হইবে। দেশকালকে অতিক্রম

করিয়া চৈতন্য সম্ভব হইবে না। তাহা হইলে দেশ ও কালকে চৈতন্যের নিয়ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ এই দুইটি পদার্থকে আত্মার স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার বলিতে হয়। প্রকৃতির সহিত আত্মার বর্ত্তমান সম্বন্ধের উচ্ছেদ হইলেও, দেশ ও কালের সংস্কার উচ্ছিন্ন হইবার নহে। ইহাই বোধ হয় সমীচীন সাংখ্যমত।

এই মত কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহার আলোচনা এই প্রবন্ধ-মালার উদ্দেশ্য নহে। কৃতবিদ্য চিন্তাশীল পাঠকেরা তদ্বিষয়ে নিজ নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন। দেশও কালের তত্ত্ববিষয়ে পণ্ডিতেরা আজিও বিসম্বাদী রহিয়াছেন।

১৯॥ আত্মার অস্তিত্ব॥

আত্মার স্বাধীন অস্তিত্ব আছে কি না—ইহা জড়ের কার্য্যমাত্র কি না, এতদ্বিষয়ে সাংখ্যদর্শনে ভূরিভূরি আন্দোলন পরিদৃষ্ট হয়। এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ এতদ্দেশীয় নাস্তিবাদীদের একটি প্রসিদ্ধ তর্ক আছে যে, যদিও একটি মাধ্বীক ফলের (মহুয়ার) মাদকতাশক্তি দৃষ্ট হয় না; কিন্তু অনেক মাধ্বীক ফল একত্র করিলে তাহা হইতে মদ প্রস্তুত হইতে পারে এবং মত্ততা জন্মে। তদ্রূপ নানাবিধ ভৌতিক পদার্থে দেহ নির্ম্মিত; যদিও তাহাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক চৈতন্য নাই, তত্রাচ তাহারা একত্রীভূত হইলে চৈতন্য উৎপাদন করে। অতএব চৈতন্যকে সংহত জড়ের ধর্ম্ম বলিতে হইবে। আত্মার স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকারে প্রয়োজন নাই।

ইহার উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন;—

"পাঞ্চভৌতিকো দেহঃ" ৩—১৭।

কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে,—পঞ্চভূতে দেহ নির্ম্মিত—

"চতুর্ভৌতিকমিত্যেকে।" ৩—১৮।

আবার কেহ কেহ আকাশকে বাদ দিয়া চারিভূতে দেহ গঠিত বিবেচনা করেন—

"একভৌতিকমিত্যপরে।" ৩—১৯।

পুনর্ব্বার কেহ কেহ বলেন যে, দেহ কেবল "ক্ষিতি" নামক ভূতেই গঠিত; অন্যান্য ভূতে মৃত্তিকাগঠিত দেহকে ধারণ করে মাত্র (উপষ্টম্ভকমাত্র)। সে যাহাই হউক—

"ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং।"

—চৈতন্যকে দেহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলা যায় না—কেন না—

"প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ।" ৩—২০।

—দেহের প্রত্যেক উপাদানে তাহা লক্ষিত হয় না।

"প্রপঞ্চ মরণাদ্যভাবশ্চ।" ৩-২১।

—আর যদি চৈতন্য ভৌতিক ক্রিয়ায় হইত তাহা হইলে সংসারে সুষুপ্তি ও মরণের অভাব হইত। যদি চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম হইত তাহা হইলে তোমাদের কোনও কালে গভীর নিদ্রা হইত না। গভীর নিদ্রায় যে, দেহ অচেতন হয়—ইহাতেই তাহাকে স্বভাবতঃ অচেতন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। যদি বল;—

"মদশক্তিবচ্চেৎ"—

—ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের যোগে মদশক্তি যেমন উদ্ভব হয়, দেহের চৈতন্যও তদ্রূপ।

উত্তর—"প্রত্যেক পরিদৃষ্টে সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ।" ৩—২২।

—যদি দেহের প্রত্যেক উপাদানে চৈতন্য দেখিতাম তাহা হইলে এ কথা একদিন বলা যাইত। কেন না প্রত্যেকে যাহা নাই—তাহাদের সংহতিতে তাহার আবির্ভাব সম্ভবে না।

এ তর্কটি বড় ভাল বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে যেন প্রতিপক্ষদেরই জয়লাভ হইয়াছে। প্রতিপক্ষদের কথাই এই যে,

প্রত্যেকে যাহা নাই তাহা সংহতিতে উৎপন্ন হইতে পারে, যেমন মাধ্বীকের মদশক্তি। ইহার উত্তর কি ?—এ কথা একদিন বলা যাইতে পারে যে, যেমন একটি মহুয়াতে মদশক্তি না থাকিলেও অনেক মহুয়াতে তাহা উদ্ভব হয়—সত্য ;—কিন্তু অনেক মাটি একত্র করিলে—কিম্বা অনেক জল একত্র করিলে কি তাহাতে চৈতন্য জন্মে ? প্রতিপক্ষদের দৃষ্টান্তের সহিত দেহের সাদৃশ্য নাই।

তবে রসায়নশাস্ত্রের দৃষ্টান্তে আপত্তি করা চলে যে, একজাতীয় ভৌতিক পদার্থে প্রত্যেকে যে গুণ লক্ষিত হয় না—ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ভৌতিক পদার্থের রসায়নিক মিশ্রণে সে গুণও লক্ষিত হয়। দেহের চৈতন্য যদি সেরূপ হয় ? ইহার উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন ;—

"নভূত চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ সাংহিত্যেঽপি চ সাংহত্যেঽপিচ।" ৫—১২৯।

"দেহ" বিরোধ স্থল ;—দেহ ছাড়িয়া ভৌতিক পদার্থের প্রত্যেকে কিম্বা সংহতিতে তোমরা যদি অন্য কোনও স্থলে চৈতন্য দেখাইতে পার ত বিশ্বাস করি। তোমরা রাসায়নিক উপাদানে একটি কীট গড়িয়া দাও তবে তোমাদের যুক্তির যাথার্থ্য অঙ্গীকার করিব।

এই উত্তরে রসায়নবাদীগণকে নিরস্ত করা চলে বটে ; কিন্তু ইহাতে কোনও মীমাংসা হইল না। ইহাতে সন্দেহ থাকিয়া গেল। চৈতন্যকে দেহের ধর্ম্ম বলিয়া অকাট্য যুক্তি দ্বারা এপর্য্যন্ত প্রতিপন্ন করিতে কেহ সক্ষম হয় নাই সত্য ; কিন্তু চৈতন্য যে, আত্মার ধর্ম্ম তাহারই বা অকাট্য যুক্তি কি ? চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম ইহা এক কথা ; চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম নয় ইহা আর এক কথা। চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম কি না, এই বিচারে যতক্ষণ না চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম নয়—ইহা প্রতিপন্ন হয়—ততক্ষণ অন্ততঃ

সন্দেহের অবসর থাকিয়া যায়। কেন না, দেখা যায় দেহকে আশ্রয় না করিয়া চৈতন্য থাকে না। কৃত্রিম দেহে চৈতন্য সঞ্চার করা যায় সত্য—কিন্তু দেহ ভিন্ন অন্য কুত্রাপি চৈতন্যের সত্তা কি কেহ দেখিয়াছেন? সাংখ্যেরা বলেন;—

অস্তি আত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ। ৬—১।

চৈতন্যের আধারভূত আত্মা নাই, এ কথা কেহ প্রমাণ করিতে পারিবেন না; অতএব আত্মা আছে ইহা সিদ্ধ।

কিন্তু আত্মা নাই ইহার প্রমাণ না থাকিলেও আত্মা আছে ইহার প্রমাণ কি? সাংখ্যেরা হয় ত বলিবেন—প্রতীতি।

প্রত্যেক মনুষ্যের "আমি বা অহং" বলিয়া প্রতীতি হয়;—সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু প্রতিপক্ষেরা এস্থলে আপত্তি করিতে পারেন যে, সাংখ্যাচার্য্যদের মতে "অহঙ্কার" আত্মার স্বভাবসিদ্ধ চৈতন্যের অঙ্গ নহে। এমন কি প্রকৃতিপুরুষের সংযোগজন্য যে জ্ঞান হয়, যাহার পারিভাষিক নাম "মহৎ" তাহার আদি স্ফূর্ত্তিতেও অহ-ঙ্কারের সদ্ভাব নাই। এ অবস্থায় অহঙ্কারের প্রতীতি দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব কি রূপে সিদ্ধ হয়?

সাংখ্যেরা আরো কতিপয় প্রমাণের উল্লেখ করেন, যথা—

শরীরাদি ব্যতিরিক্তঃ পুমান। ১—১৩৯।

আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন; কেন না—

সংহত পরার্থত্বাৎ। ১—১৪০।

—দুই বা ততোধিক দ্রব্যের মিশ্রণ, তৃতীয়ের কোন আবশ্যক ব্যতিরেকে ঘটে না; সুতরাং পাঞ্চভৌতিক শরীর—আত্মার কোনও প্রয়োজনসাধনের জন্যই অবশ্য হইয়াছে। যদি এই যুক্তি ভাল না লাগে—আরো বলি—

॥ ত্রিগুণাদি বিপর্য্যাৎ ॥ ১—১৪১।

—চৈতন্য যে আত্মার লক্ষণ, প্রাকৃতিক পদার্থের গুণের সহিত তাহার কোনও সাদৃশ্য নাই।

॥ অধিষ্ঠান চ্চেতি ॥ ১—১৪২।

—অপরঞ্চ—আত্মা দেহের অধিষ্ঠাতা; আত্মার ইচ্ছামতে দেহ চালিত হয়। ইচ্ছাশক্তির অনুভাব আত্মার অস্তিত্বসিদ্ধ।

॥ ভোক্তৃভাবাৎ ॥ ১—১৪৩।

সুখদুঃখের ভোক্তা বলিয়া আত্মার অনুভব হয়, তাদৃশ অনুভবেও আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ।

স্থানান্তরে আরো এক প্রমাণের উল্লেখ দেখা যায়,—যথা

দেহাদিব্যতিরিক্তোঽসৌবৈচিত্র্যাৎ ॥ ৬—২।

ইহা "ত্রিগুণাদি বিপর্য্যাৎ" সূত্রের পুনরুক্তিমাত্র। পুনশ্চ—

ষষ্ঠীব্যপদেশাৎ অপি ॥ ৬—৩।

—অর্থাৎ "আমার শরীর"—"আমার বুদ্ধি" ইত্যাদি স্থলে শরীর হইতে বিভিন্ন আত্মার অনুভব দেখা যায়। সাংখ্যেরা আরো বলেন;—

সামান্যেন বিবাদাভাবাৎ ধর্ম্মবন্ন সাধনম্ ॥ ১—১৩৮।

টীকাকার অন্য সূত্রের টীকায় লেখেন;—

"জানামীত্যেবং প্রতীয়মানতয়া পুরুষঃ সামান্যতঃ সিদ্ধ এবাস্তি।"

—যখন "জ্ঞান হইতেছে" বলিয়া প্রতীয়মান হয়—তখন মনুষ্যমাত্রেই আত্মার অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করে। সামান্যতঃ আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও বিবাদই নাই। এবং তদ্বিষয়ে অন্য সাধন বা প্রমাণেরও আবশ্যকতা নাই। তবে আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন কি না, তাহা উপরোক্ত হেতুদ্বারা নির্ণয় হয়।

সাংখ্যশাস্ত্রের সমুদায় যুক্তি একত্র করিলে এইরূপ দেখা যায়। আত্মা আপনার অস্তিত্বের এবং আপনার অবস্থান্তরের

অনুভব সর্ব্বদাই করিয়া থাকে। আপনার জ্ঞান—আপনার সুখ-দুঃখ—আপনার রাগদ্বেষ—আপনার ইচ্ছাশক্তির অনুভবে আত্মা স্বীয় অস্তিত্বের অনুভব সর্ব্বদাই করিয়া থাকে। অতএব আত্মার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ। আর সেই আত্মা যে, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে, জ্ঞান সুখদুঃখ রাগদ্বেষ ইচ্ছাদি যাহা আত্মার অবস্থা এবং গুরুত্ব চঞ্চলত্ব প্রকাশকত্বাদি যাহা জড়ের অবস্থা, এই উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। যাহাদের অবস্থা এরূপ বিসদৃশ তাহাদিগকে অভিন্ন পদার্থ বলা যায় না। "গতিতে" ও "জ্ঞানেতে" আকাশপাতাল প্রভেদ। এই দুইটি সম্পূর্ণ বিসদৃশ অবস্থা যে, একই পদার্থের এপিঠ ওপিঠ তাহা কল্পনা করাও অসম্ভব।

অতএব আত্মার স্বাধীন অস্তিত্ব সম্বন্ধে "চৈতন্যের স্বতঃসিদ্ধতা"—"ত্রিগুণ হইতে বৈচিত্র্য"—"অধিষ্ঠাতৃত্ব" এবং "ভোক্তৃভাব" এই চারিটি যুক্তিকেই প্রাধান্য প্রদান করিতে হয়।

বারাণসী।

বৃহৎ ভারতবর্ষের নানা জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যদি কোথাও আন্তরিক মিলনক্ষেত্র থাকে ত সে এই প্রাচীনা দেবধানী বারাণসী। তাহার প্রাচীন কীর্ত্তি সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে এবং তাহার প্রধান দেবতা বিধর্ম্মীর উপদ্রবে মন্দির ছাড়িয়া বাপীমধ্যে আশ্রয় লইয়াছেন; কিন্তু তথাপি বারাণসীই ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান এবং তিব্বতপ্রান্ত হইতে সেতুবন্ধাবধি বহুকোটি মানবের একমাত্র অন্তিম কামনা। ভারতবর্ষে তীর্থ

আরও অনেক আছে এবং যাত্রীর ভীড় সকলগুলিতেই যথেষ্ট; কিন্তু বারাণসীতে কেবলমাত্র যাত্রীর ভীড় নহে, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের বহু মুমুক্ষু ও বহু ভক্ত গৃহ ছাড়িয়া চিরদিনের মত এই পুণ্যতীর্থে দিনযাপন করিতে আসেন। এবং এই বহু দূরদেশের বহু লোকসমাগমে বারাণসী সুবৃহৎ ভারতবর্ষের একটি সংহত সংক্ষিপ্তসার বলিয়া প্রতিভাত হয়।

আমাদের রাজনৈতিক মিলনক্ষেত্র কলিকাতায় নানা প্রদেশের বহু লোকসমাগম হয় বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ সেখানে নিজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেখা দেয় নাই; প্রস্তর দিয়া আপন স্থায়ী আবাস নির্ম্মাণ করে নাই, ইঁট কাঠ দিয়া বিদেশী ছাঁচে অচির-স্থায়ী আপিস গড়িয়া রাখিয়াছে। বারাণসীতে তাহা নহে, হিন্দুস্থানের সকল সম্প্রদায়ই এখানে আপনাপন স্থায়ী চিহ্ন অক্ষয় কীর্ত্তি বহুযত্নে স্থাপন করিয়াছে এবং এই সকলগুলিই সমান ভাবে হিন্দুসন্তানের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে। ইহাতে ফল হইয়াছে এই যে, দেবমন্দিরে আসিয়া ক্ষুদ্র জাতিবিদ্বেষ আর প্রধূমিত হইয়া উঠে না এবং সকলেই আপন আপন প্রাদেশিক গর্ব্ব বিস্মৃত হইয়া এক মহা হিন্দুজাতিগৌরবে আপনাকে সম্মানিত জ্ঞান করিতে থাকে।

এই যে বিভিন্ন প্রদেশীয়দিগের মধ্যে একটি অকপট ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন—ইহাতেই বারাণসীর এত মাহাত্ম্য। এবং আদিম কাল হইতে অদ্যাবধি চিরদিনই বারাণসী ভারতবর্ষের ধর্ম্মধানী-রূপে এই মহাকর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিয়াছে। কেবলি যে, শৈব ধর্ম্মের গৌরবে বারাণসীর আজি এত প্রভাব তাহা নহে, এই গঙ্গা বরুণার সঙ্গমক্ষেত্রে অতি প্রাচীন কাল হইতেই নানা শাস্ত্র, নানা তত্ত্ব, নানা মত, নানা অনুষ্ঠান আসিয়া সঙ্গত হইয়াছে; এবং ভারতবর্ষের বিশাল বক্ষের উপর দিয়া মধ্যে মধ্যে

যে প্রবল ধর্ম্মান্দোলন বহিয়া গিয়াছে তাহারও সূচনা অনেক সময় এই বারাণসীর ধর্ম্মসঙ্গমে।

যে বৌদ্ধ মত এক সময়ে ব্রাহ্মণ্যের সমস্ত দেবতাগর্ব্ব চূর্ণ করিতে বসিয়াছিল এবং আজিও যাহা ব্রাহ্মণ্যের শাসনে দেশান্তরিত হইয়া রহিয়াছে তাহার প্রথম প্রতিষ্ঠা এই শিবধামে। এইখানেই বুদ্ধ প্রথম উপদেশদান সুরু করেন এবং এইখান হইতেই দেশবিদেশে তাঁহার বৈরাগ্য প্রচার হইতে আরম্ভ হয়। সরনাথে রাজা অশোকের যে ভগ্নাবশেষ স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এই আদিম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারেরই স্মৃতিস্তম্ভ। এই সেই পুরাতন মৃগদাব কানন—যেখানে প্রথম কেবলমাত্র কতিপয় শিষ্যমধ্যে অহিংসার মহামন্ত্র প্রচারিত হয় এবং সমাগত শিষ্যমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বোধিসত্ত্ব সকলকে দিকে দিকে এই মহাধর্ম্ম প্রচারে বাহির হইতে আদেশ করেন।

তখন বুদ্ধের ষষ্টি জন মাত্র শিষ্য সম্বল। এবং বারাণসী ভারতবর্ষের সমস্ত পাণ্ডিত্যের মহাদুর্গ। প্রতি সন্ধ্যায় মন্দিরে মন্দিরে দেবতার নামে যখন সহস্র কণ্ঠ হইতে বেদধ্বনি উত্থিত হইত, পঞ্চ ক্রোশের মধ্যে সমস্ত নূতন মত, নূতন ধর্ম্ম, নব উদ্যম ভূমিকম্পে বাসুকীর শিরসমূহের ন্যায় সঘনে বিচলিত হইয়া উঠিত। এই শৈব পুরীমধ্যে বিধর্ম্মীর বিহার নির্ম্মাণ হইবে এমন কেহ কখনও স্বপ্নেও মনে করিত না।—কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মও কালক্রমে নগরমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। এবং বারাণসীর তীর্থক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য যাত্রীর ন্যায় বৌদ্ধ যাত্রীরও সমাগম হইতে লাগিল। এমন কি, সেদিনও হিয়োন্থ সাং যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, বারাণসীতে অনেকগুলি বৌদ্ধ বিহার এবং প্রায় তিন চারি সহস্র বুদ্ধমতাবলম্বীর বাস ছিল।

এইরূপে দুই মহা ধর্ম্মপ্রবাহের আদিস্থান হইয়া বারাণসী ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। শুধু ভারতবর্ষ কেন, বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মোত্রী হইয়া বারাণসী সমগ্র পূর্ব্ব এসিয়ার আদি তীর্থ। এবং যখন মনে করা যায় যে, পৃথিবীর কত কোটি লোক এই প্রাচীনা ধর্ম্মধানীর দিকে চাহিয়া চিরজীবন কি অমোঘ সান্ত্বনা লাভ করে, তখন বারাণসীর মাহাত্ম্য অনুভব না করিয়া থাকা যায় না। জাপান হইতে গুর্জ্জর অবধি একদিন আবশ্যক হইলে যদি কেহ একত্র করিতে পারে ত সেই সনাতন গাঙ্গ্য পুণ্যভূমি।

কিন্তু হায়, সে দিন শুধু স্বপ্নের কথা। বারাণসীতে বৌদ্ধধর্ম্মের আর কি আছে? যেখানে বিহার ছিল সেখানে মস্‌জিদ উঠিয়াছে; যেখানে অহিংসাই একমাত্র ধর্ম্ম ছিল, ধর্ম্মান্ধ মুসলমান দস্যু সে স্থানকে রক্তস্রোতে কলঙ্কিত করিয়াছে; যে মৃগদাব কাননে একটি মৃগহত্যা হইতে পাইত না সেখানে শত শত অসহায় মানবশিশু পঙ্গপালের মত জ্বলন্ত হুতাশনে দগ্ধ হইয়াছে। সরনাথের সেই দগ্ধাবশেষ এখন শুধু পুরাতত্ত্বান্বেষীর হৃদয়ে বিস্ময় ও ক্ষোভ সঞ্চার করিয়া দেয় মাত্র এবং মানুষের প্রতি মানুষ যে কতদূর নৃশংস হইতে পারে তাহারই পরিচয় দিয়া থাকে।

সন্ন্যাসীদিগের অপরাধ, তাঁহারা মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না; এবং এই অপরাধে গুরুদণ্ড, অগ্নিতে নির্ব্বাণ। তখন আহারসময়। গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া তাঁহারা যে অন্নটুকুর সংস্থান করিয়াছিলেন এই মৃগদাবের পুণ্যক্ষেত্রে সকলে একত্র হইয়া তাহাই সেবন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এমন সময় শাণিত অসিহস্তে সহসা অশ্বারোহীদল আসিয়া উপস্থিত। এক

হস্তে তরবারি, অপর হস্তে কোরাণ। হয় জীবন হইতে মুক্তি, নয় পুরাতন সমস্ত বন্ধন ছেদন। নির্ব্বাণপরায়ণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা জীবনকেই তুচ্ছ করিলেন, তাঁহাদের মুখের গ্রাস মুখে রহিয়া গেল; নিমেষের মধ্যে সেই বৃহৎ বিহারক্ষেত্র ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই মৃত্যুদৃশ্যের মধ্য হইতে বিজয়ী সেনার আনন্দ-কলরব উত্থিত হইয়া দশদিকে এক ভীষণ বিদ্রূপের ন্যায় ধ্বনিত হইতে লাগিল।

সরনাথ ধ্বংস করিয়াই যদি মুসলমানদিগের মনের ক্ষোভ মিটিত, তাহা হইলেও রক্ষা ছিল। কিন্তু তাহারা অল্পে সন্তুষ্ট হইবার পাত্র নহে। সহরে যত বৌদ্ধ বিহার ছিল তাহা কতক ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল, কতকগুলির উপর গম্বুজ ও মিনার উঠাইয়া দিল। বারাণসীতে প্রাচীন কীর্ত্তি এখন যাহা দেখা যায় তাহা এই গম্বুজ ও মিনারের অন্তরালে সাধারণের দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন।

হিন্দুদিগের যে সকল দেবালয় আছে তাহার একটিও অধিক দিনের নহে। প্রাচীন যাহা ছিল তাহা মসজিদে পরিণত হইয়াছে। এবং বিশ্বেশ্বরের অভ্রভেদী স্থাপত্যগৌরব থর্ব্ব হইয়া অবধি বারাণসীতে মন্দিরের চূড়া আর আকাশ ভেদ করিয়া উঠে নাই। তথাপি গঙ্গাবক্ষ হইতে কাশীধামের দৃশ্যটি অতি মনোহর। মন্দিরের পর মন্দির, অট্টালিকার পর অট্টালিকা, নদীগর্ভ পর্য্যন্ত লোকপরিপূর্ণ পাষাণসোপানাবলী। সন্ধ্যাবেলায় মন্দির-তোরণে প্রতিদিন নহবৎ বসে; প্রতিদিন অগণ্য যাত্রী দশাশ্বমেধে স্নান করিয়া পূত হয়; এবং মণিকর্ণিকায় চিরপ্রজ্বলিত চিতাগ্নি মহাকালের অলঙ্ঘ্য মহিমা প্রচার করে।

কতদিন হইতে যে এইরূপ চলিয়া আসিতেছে কে জানে!

সকলই যে অতি প্রাচীন তাহা নহে এবং সকলই যে আধুনিক তাহাও নহে। কালে কালে নানা কারণে কাশীধামের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং নানা জাতীয় বিচিত্র লোকসমাগমে বিভিন্ন দেবতার সহিত নানাবিধ অনুষ্ঠানও দুই দশটা করিয়া কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। হয় ত যেখানে পূর্ব্বে পতিত ভূমি ছিল সেখানে একটি নূতন মন্দির বা ঘাট উঠিয়া অবধি কতকগুলি অর্দ্ধপৌরাণিক গল্প আসিয়া জুটিয়াছে এবং তদবধি সে স্থানে স্নান বা দান বা কোনও একটি বিশেষ কর্ম্মের অনুষ্ঠান অত্যন্ত পুণ্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। হয় ত কোথাও কোন একটি স্মরণীয় উপদ্রব ঘটিয়াছিল এবং সেই উপদ্রব শান্তিহওনাবধি একটি দেবাসুরসংগ্রামকাহিনী যুক্ত হইয়া সেই স্থানের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিয়াছে। এমনি করিয়া আদিম কাল হইতে এ পর্য্যন্ত কাশীর প্রায় প্রত্যেক পাষাণখণ্ড অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনীসংযোগে এক একটি ক্ষুদ্র তীর্থ হইয়া উঠিয়াছে। কোন্‌টি যে কতকালের প্রাচীন সকল সময় তাহা ঠাহরাইয়া উঠা কঠিন।

কিন্তু বিশ্বেশ্বর বারাণসীর আদিদেবতা তাহাতে সন্দেহ নাই। চীন পরিব্রাজকেরা ভারতে আসিয়া বিশ্বেশ্বরের পূর্ণ গৌরব দেখিয়াছেন। এবং বুদ্ধ যে এত দেশ থাকিতে বারাণসীকেই তাঁহার প্রথম প্রচারক্ষেত্ররূপে বরণ করেন, সে কেবল এই বিশ্বেশ্বরের গৌরবে সাধারণ্যে তখন বারাণসীর সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা দেখিয়া। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইলে এই ধর্ম্মধানী হইতে আরম্ভ করাই শ্রেয়।

কারণ, বারাণসীতে নানা সম্প্রদায়ের বহু পণ্ডিত ও সাধু সন্ন্যাসীগণ সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেন। তাঁহাদের সহিতই ধর্ম্ম

আলোচনার সুবিধা। এবং ইঁহাদের মতিগতি ফিরাইতে পারিলে ভারতবর্ষের মতিগতি ফিরানও অনেক সহজ হইয়া আসে।—কিন্তু সমগ্র বারাণসীকে বুদ্ধ স্বমতে আনিতে পারেন নাই। যদিও বারাণসীর দেবধর্ম্মে বৌদ্ধ প্রভাব একেবারে নিষ্ফল হইয়াছিল এমনও বোধ হয় না। অদ্যাবধি সেখানে যে সকল নানা সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী দেখা যায় তাহাতে সময় সময় বৌদ্ধ প্রভাব অনুমিত হয়।

কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রম বিশেষরূপে বৌদ্ধ আশ্রম নহে। এবং হিয়োন্থ সাং আসিয়া বিশ্বেশ্বরের দ্বারে যে অগণ্য নগ্ন ও ভস্মাবৃত-তনু সন্ন্যাসী দেখিয়াছিলেন তাহা শ্মশানবাসী শিবেরই আদর্শানুরূপ। বৌদ্ধধর্ম্ম এই সন্ন্যাসাশ্রমে একটা নূতন জীবন সঞ্চার করিয়াছে মাত্র। এবং সেই হইতে দেশে প্রব্রজ্যার গৌরব অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বহুদিনের বিচ্ছেদবশতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম আমাদের যতটা দূর হইয়া পড়িয়াছে, বাস্তবিক তাহার সহিত আমাদের সেরূপ দূর সম্পর্ক নহে। বৈরাগ্যপ্রবণ ভারতবর্ষে বুদ্ধ একেবারে নূতন কিছুই প্রচার করেন নাই; অনেকগুলি মত ও বিশ্বাস যাহা দর্শন-শাস্ত্রের নিভৃত নিকেতনে নিয়ত আলোচিত হইত, সেইগুলিকে একটি নির্দ্দিষ্ট গঠন দিয়া তিনি সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছেন মাত্র। এবং ইহারই আনুষঙ্গিকরূপে কতকগুলি বিশেষ আচার অনুষ্ঠান স্বাভাবিক নিয়মে ধর্ম্মের চতুর্দ্দিকে স্তরে স্তরে সংসক্ত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট ইহা কখনও বিজাতীয় ধর্ম্মরূপে প্রতিভাত হয় নাই। ভারতবর্ষে বহুদিন ধরিয়া শৈব ও বৌদ্ধ দুই ধর্ম্ম বরাবর পাশাপাশি ছিল। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে,

মধ্যে মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইলেও, পরস্পরের প্রতি হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষভাব কখনই ছিল না। বরঞ্চ, উভয় সম্প্রদায়ই উভয়ের ধর্ম্মগুরুদিগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত।

ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি এই গুণে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ। পরের মত তাহাদিগের একেবারে অসহ্য নহে। সেই জন্য লিঙ্গপূজা বৌদ্ধ নির্ব্বাণতত্ত্বের পরিপুষ্টির ব্যাঘাত করে নাই। অথচ এই দুয়ের মধ্যে মূলেই বিরোধের সূচনা রহিয়াছে। বৌদ্ধ নির্ব্বাণ চরমে কিছুই-নাতে গিয়া শেষ হয়; এবং শিবলিঙ্গ সংহারান্তে যে শক্তি পুনর্ব্বার সমুদয় চরাচর সৃষ্টি করিবে তাহারই পরিচায়ক চিহ্ন। সুতরাং যতদিন এই শক্তি রহিয়াছে ততদিন চরাচরের চরম নির্ব্বাণের কোন সম্ভাবনা নাই। এবং এ শক্তি যখন অক্ষয়, তখন প্রলয়ের পর সৃষ্টি এবং সৃষ্টির পর প্রলয় চিরদিনই চলিবে আশা হয়। বৌদ্ধ নির্ব্বাণবাদ এই চিরন্তন সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়প্রবাহের এক জায়গায় ছেদ দিতে চাহে—যেখানে পঁহুছিয়া ভূলোক দ্যুলোক, দেব মানব, এমন কি, এই সমুদয়ের যদি কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা থাকেন তিনিও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন। আমাদের মহাপ্রলয়ও এরূপ সমুদয় সত্তার আত্যন্তিক বিলোপ-সাধন নহে, কিন্তু এক পূর্ণ সত্তায় সমস্ত ক্ষুদ্র সত্তার চরম পরিণতি মাত্র।

এই নির্ব্বাণ এবং প্রলয়ের এ পর্য্যন্ত কোনও মীমাংসা হয় নাই। কিন্তু এখন একটা আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে—এবং হিন্দুহৃদয় কোনটা শুনিলেই অতিমাত্র বিচলিত হয় না। যেমন করিয়া হউক, মায়ার পরপারে উত্তীর্ণ হইলেই হইল। জন্ম-পরিগ্রহের কষ্ট হইতে মুক্তিলাভ করাই একমাত্র কামনা। হিন্দুর লয়তত্ত্ব ও বৌদ্ধের নির্ব্বাণতত্ত্ব উভয়েরই মুখ্য কথা এই। কেবল

ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও নির্ব্বাণ লইয়া যে খট্‌কা থাকিয়া যায়, দার্শনিক পণ্ডিতেরা তাহা লইয়া বিচারবিতর্ক করিতে থাকুন। সাধারণ লোকের পক্ষে নির্ব্বাণ ও প্রলয় সমান সুসংবাদ। তবে যতদিন জীব দেহে আবদ্ধ থাকে ততদিন পিতৃপিতামহের পন্থানুসরণই সুবিধাজনক।

যাহা হউক, এই নির্ব্বাণ ও প্রলয়ের সংঘর্ষে বহু মতের বহু সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে—এবং বারাণসীই সকলগুলির প্রধান সঙ্গমক্ষেত্র। বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপরে বৌদ্ধধর্ম্মের কতদূর প্রভাব আছে না আছে এ পর্য্যন্ত সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই, কিন্তু এই বৌদ্ধ আন্দোলনের পর হইতে বৈষ্ণব দেবতাও কেহ কেহ বারাণসীর গঙ্গাতীর অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। নিরীহ জগন্নাথও তাঁহার বৌদ্ধ উৎপত্তি গোপন করিয়া কাশীধামের একপ্রান্তে যৎকিঞ্চিৎ নৈবেদ্যের উপর নির্ভর করিয়া দিনাতিপাত করিতেছেন। এবং কণারকের সূর্য্যমন্দিরের কাহিনীও বারাণসীতে যথাযথ দেশান্তরিত হইয়া আসিয়াছে।

এই সকল দেবতাসঙ্গমের মধ্যে আদিম কাল হইতে ধর্ম্মের ধারাবাহিক অভিব্যক্তির একটি ঐতিহাসিক সূত্র পাওয়া যায়। এবং এই সূত্রে অন্যান্য অনেক প্রাচীন দেশের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হয়। যেমন, লিঙ্গপূজাবলম্বনে প্রাচীন মিশরের সহিত ঘনিষ্ঠতা; সূর্য্যোপাসনাবলম্বনে প্রাচীন পারস্যের সহিত ঘনিষ্ঠতা; এবং এইরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা অনুষ্ঠান অবলম্বনে বহুতর অন্যান্য সভ্য জাতির সহিত সম্বন্ধ। একদিকে এই; এবং অন্যদিকে মানবহৃদয়ের ক্রমবিকাশের একটি সমগ্র সোপানপরম্পরা ইহারই মধ্যে নিহিত আছে। সুতরাং যে দিক দিয়াই দেখ, বারাণসীতে আসিয়া বিপুল মানবসমাজের সহিত সম্বন্ধ

সুদৃঢ় হয়। এবং এই সনাতন সম্বন্ধ নিবন্ধনেই ব্রাহ্মণীর গৌরব ভূভারতে অদ্বিতীয়।

এক বাটি দুধের জন্য।

(ফরাসী লেখক "পল ম্যুদেল্" হইতে)

১

কাজকর্ম্মের চেষ্টায় কত যে, ঘুরিয়াছি তাহার আর শেষ নাই। সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। যাহারই দ্বারে গিয়াছি, সেখান হইতেই ধাক্কা খাইয়া আসিয়াছি। মহাশয়, অবশেষে তিক্ত-বিরক্ত ও লজ্জিত হইয়া রাত্রে যখন গৃহে ফিরিলাম, তখন হাতে একটি পয়সা নাই। তিন দিন হইতে আমি একেবারে নিঃসম্বল।

কি করিয়া যে, এই তিন দিন আমরা জীবনধারণ করিলাম, তাহা বলা কঠিন। যদি মুদির দোকান হইতে ধারে খাদ্যসামগ্রী না পাইতাম, তাহা হইলে আমরা স্ত্রীপুরুষ নিশ্চয়ই ক্ষুধার জ্বালায় মারা পড়িতাম।

আমাদের ক্ষুদ্র বাসায় আসিয়া যখন দ্বার ঠেলিলাম, তখন ঘোর রাত্রি। প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমার স্ত্রীকে ডাকিলাম; কোন উত্তর পাইলাম না।

একটা ভয়ানক আশঙ্কা মনে উদয় হইল।

মদলীনা মরিয়াছে!... ......

আমি তাড়াতাড়ি অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া শয্যার

নিকট গেলাম—হাত বাড়াইয়া দেখিলাম, মদলীনা মরে নাই, মুর্চ্ছিত হইয়াছে মাত্র। কোনপ্রকারে কষ্টেসৃষ্টে তাহাকে সচেতন করিলাম।

ক্রমশঃ জ্ঞানের উদয় হইলে সে বলিল, "আ! তুমি? ভাল, কিছু পেলে কি?"

—"কিছুই না, কিছুই না!"

—"নিশ্চয়ই তবে, আমাদের পাবার আর কোন সম্ভাবনা নাই"—এই বলিয়া বেচারা কাঁদিতে লাগিল।

আমি দেখিলাম, আমার স্ত্রীকে এখন আশ্বস্ত করা আবশ্যক। যদিও আমারও হৃদয় নিরাশায় অভিভূত, নিজের কোন আশাভরসা নাই, তথাপি তাহাকে নানাপ্রকারে সাহস দিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম, আমি একটি ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়াছিলাম, তিনি আমাকে কিছুদিন পরে আসিতে বলিয়াছেন। অতএব, আমাদের এখনও কিছু দিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাকা চাই। আমাদের এই দুরদৃষ্টের এক দিন-না-এক দিন অবশ্যই অবসান হইবে। তখন সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলিয়া যাইব। তখন তুমিও শরীরে বল পাইবে। অনেকগুলি ধার আমরা শুধিয়া ফেলিব,—বাকি ধারগুলি পরিশোধ করিবার একটা বন্দোবস্ত করিব। আমাকে কাজকর্ম্ম করিতে দেখিলে, লোকেরাও আবার আমাকে ধার দিবে। এইরূপে একবার প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া উঠিতে পারিলে, আমাদের অবস্থা একটু স্বচ্ছল হইলে, এই বাসা ছাড়িয়া দিয়া, ইহা অপেক্ষা একটু ভাল বাসায় গিয়া উঠিব। সেখানে কিছু গাছপালা, একটু বাতাস, একটু আলো থাকিবে। আমরা সেখানে স্বচ্ছন্দে বাস করিব—আমাদের পূর্ব্ব সুখ আবার ফিরিয়া আসিবে।

আমার হাতের মধ্যে তাহার হাতটি সাপটিয়া ধরিয়া এই-রূপ অনেকক্ষণ বলিতে লাগিলাম। আমার কথার গুন্‌গুন্‌ স্বরে, তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল—বেশ প্রশান্তভাবে ঘুমাইয়া পড়িল। প্রশান্তভাবে?—না, তাহা ঠিক নয়; কারণ, একটু পরেই আমি আমার হস্তের স্পর্শে অনুভব করিতে লাগিলাম, কোন দুঃস্বপ্ন দেখিলে যেরূপ হয়, তাহার হাত সেইরূপ থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে—এবং বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত করিলে যেরূপ হয়, এক একবার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠি-তেছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপবাক্য—গোঁ গোঁ শব্দ মধ্যে মধ্যে মুখ হইতে বাহির হইতেছে। তাহার পর, একেবারে নিস্পন্দ অসাড়—সে আরও ভয়ানক। আমি ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহার বাহু ও মুখ টিপিয়া দেখিলাম—বুঝিলাম, মরে নাই!

সেই ঠাণ্ডা অন্ধকার ঘর, চারিদিক নিঃশব্দ—কেবল রোগীর মুখ-নিঃসৃত অস্পষ্ট কাতর-ধ্বনিতে সেই নিস্তব্ধতা মধ্যে মধ্যে ভঙ্গ হইতেছে। আঃ! সে কি ভয়ানক রাত্রি—আঃ! কি করি-য়াই সে রাত্রি কাটাইয়াছি!

২

যাহাই হউক, গোড়ায় আমার জীবন সুখে আরম্ভ হইয়া-ছিল। আমার শৈশবাবস্থা দেখিলে মনে হইতে পারে, আমার ভবিষ্যৎ জীবন সুখস্বচ্ছন্দে ও মানসম্ভ্রমে বুঝি অতিবাহিত হইবে। আমার পিতামাতা যদিও সামান্য অবস্থার লোক—আমার পিতা কোন আফিসে সামান্য চাকুরি করিতেন মাত্র—কিন্তু তিনি চিরজীবন পরিশ্রমসহকারে অর্থোপার্জ্জন করিয়া-ছিলেন। আমাকে তিনি শিক্ষার্থে কালেজে প্রেরণ করেন। আমি কালেজের একজন উজ্জ্বল ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া-

ছিলাম।—বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিব এরূপ আশা হইয়াছে এমন সময়ে আমার পিতামাতা একে একে অল্পদিনের ব্যবধানে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাহার জন্য আমি আর এখন আক্ষেপ করি না। কারণ, তাঁহারা এত দিন বাঁচিয়া থাকিলে আমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেন।

কালেজ হইতে বহির্গত হইয়া, আমার কোন বন্ধুর পিতার অনুগ্রহ ও সাহায্যে, কোন একটি বড় ব্যাঙ্কের আফিসে অতিরিক্ত কর্ম্মচারী পদে ভর্ত্তি হইলাম। আমার বার্ষিক বেতন সাত শত টাকা। আমি পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান ছিলাম—শীঘ্রই কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে আদর্শস্থল হইয়া উঠিলাম; অল্পদিনের মধ্যেই স্থায়ী পদে নিযুক্ত হইলাম, ক্রমশঃ অবস্থা আরও অনুকূল হইয়া উঠিল—দ্রুতগতি উন্নতি লাভ করিতে লাগিলাম। অবশেষে ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চি হঠাৎ মারা পড়ায়, খাজাঞ্চির পদ খালি হইল। আমি সেই কাজ পাইলাম। আমার বার্ষিক ১৫০০৲ টাকা বেতন হইল। আমার তখন বয়স ২৫ বৎসর। দেখুন মহাশয়, এমনটি সচরাচর সকলের অদৃষ্টে ঘটে না।

এই সময়ে আমার কোন বন্ধুর বাড়িতে মদলীনার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। সেও আমার ন্যায় পিতৃমাতৃহীন—কাহারও অধীন নহে। তার কিছুমাত্র সম্পত্তি ছিল না কিন্তু এমন সুশ্রী, মুখে এমন একটি মধুর ভাব, যে, তাহাকে দেখিবামাত্র একটি প্রেমময়ী সঙ্গিনী ও সুনিপুণা গৃহিণীর ভাব সহসা মনে আইসে। তাই, আর ইতস্ততঃ না করিয়া আমি তাহার হস্তের প্রার্থী হইলাম। আমার তখন ১২৫৲ টাকা মাসিক আয়, ভবিষ্যতেও বৃদ্ধির সম্ভাবনা; মনে করিলাম, কোনও প্রকারে খাওয়া-পরা চলিয়া যাইবে।

কাজেও দেখিলাম, মদলীনা বেশ বুদ্ধিমতী ও পরিশ্রমী। এমন নিপুণতার সহিত সে ঘরকন্না করিতে লাগিল, এমন অল্প-ব্যয়ে ও বিবেচনার সহিত সংসার চালাইতে লাগিল, যে, আমি যে বেতন পাইতাম তাহাতেই বেশ সংকুলান হইতে লাগিল এবং শুধু তাহা নয়, আমাদের বিবাহের দ্বিতীয় বৎসরের মধ্যেই ভাবী দুঃসময়ের জন্য কিছু টাকা সঞ্চয় করিতে পারিলাম। আমাদের ছোট ঘরটি বেশ ফিট্‌ফাট্ হইল ও আয়নার মত ঝক্‌ঝক্ করিতে লাগিল। আমার স্ত্রী সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গান গাহিত এবং আমি যখন আফিস হইতে বাড়ি আসিতাম, তখন রাস্তার ধার হইতে দেখিতে পাইতাম, আমার বাড়ির জান্‌লার পর্দার পিছনে আমার স্ত্রী সতৃষ্ণ নয়নে আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে! তখন আমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিত এবং আমি সিঁড়ির চার চার ধাপ ডিঙ্গাইয়া তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া তাহাকে আমার আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিতাম। হাঁ, তখন আমাদের সুখের আর সীমা ছিল না!

(৩)

কিন্তু অতি সুখ বেশি দিন থাকিবার নহে। একদিন আফিসে আসিয়া দেখিলাম, আমার আফিসের বাক্‌স হইতে ৪০০০৲ টাকা অন্তর্হিত হইয়াছে। পূর্ব্বদিনে আফিস হইতে আসিবার পূর্ব্বে ঐ টাকা আমি বেশ গুছাইয়া রাখিয়াছিলাম, আমার বেশ মনে আছে। আমার সমস্ত চেক্‌গুলি একে একে দেখিলাম, আমার চোতাগুলি ভাল করিয়া মিলাইলাম, আবার ফের তেরিজ কসিয়া দেখিলাম—দেখিলাম গণনায় কোন ভুল নাই, চোতার অঙ্কও ঠিক আছে। তবু ৪০০০৲ টাকা বাক্‌সের মধ্যে কমি হইতেছে। ব্যাঙ্কের বড় সাহেব ও আমি ছাড়া আর কাহারও নিকট বাক্-

সের চাবি থাকে না। যেমন তালা দেওয়া ছিল, তেমনি আছে। তাহার কোন নড়্-চড়্ হয় নাই। যাহাতে তালা ভাঙ্গিবার চেষ্টা প্রকাশ পায় এরূপ জোর-জবর্দ্দস্তির চিহ্ন কোথাও নাই। কি করিয়া টাকাটা গেল কিছুই ত বুঝা যায় না।

প্রথমেই মনে হইল, বড় সাহেবকে এখনি গিয়া জানাই; কিন্তু তাহার পরেই একটা কথা মনে হওয়ায় আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন শিহরিয়া উঠিল। সে কথাটা এই;—যদি আমার কথায় তাঁহাদের বিশ্বাস না হয়!

কিন্তু আমার মুরুব্বিরা ইহা বিলক্ষণ জানিতেন, আমি ঐ টাকা কখনই আত্মসাৎ করিব না। আমার দ্বারা সেরূপ গর্হিত কার্য্য হওয়া অসম্ভব। যে পর্য্যন্ত তহবিলের ভার আমার হাতে আসিয়াছে, এক দিনের জন্যও হিসাবের গোল হয় নাই। কিন্তু তহবিলে এত টাকা কেন কমি হইতেছে যখন তাহার কোন প্রকার কৈফিয়ৎ দিতে পারিব না, তখন তিনি কি ভাবিবেন? আর, যদি আমি তখন ভ্যাবা-চ্যাকা খাইয়া যাই, কিম্বা আম্‌তা-আম্‌তা করি, তখন তাহাতেই কি আমি দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইব না? এইরূপ সাধারণ সংস্কার আছে যে, দোষী ছাড়া আর কেহই ভয়ে কাঁপে না।

হায়! অনেক সময় তাহার বিপরীতই সত্য বলিয়া মনে হয়।

তা' যাই হোক্ দোষী হই বা নির্দ্দোষী হই, জবাবদিহি ত আমারই—আমার কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই।

সাফাই হইবার একটা উপায় বাহির করিবার জন্য অনেক মাথা খুঁড়িলাম, কিন্তু কিছুই হইল না। যে সময়ে আমি দুর্ভাবনার জালায় অস্থির, সেই সময়েই হয় ত কার্য্যোপলক্ষে আগত লোকদিগের কথার উত্তর দিতে হইতেছে—ভিন্ন দপ্তরের

কর্ম্মচারীদিগের সম্মুখে হাসি-মুখ দেখাইতে হইতেছে, কিম্বা আমার দফ্‌তরের পেয়াদাদিগকে আদেশ প্রদান করিতে হইতেছে।

এই গোলমালের মধ্যে, একটা চিন্তা আমাকে কিছুতেই ছাড়িতেছে না, তাহা জলন্ত অক্ষরে আমার চখের সাম্‌নে ক্রমাগত যেন নৃত্য করিতেছে—সে কথাটি এই ;—ছয়টার সময় যেরূপ দস্তুরমত বড় সাহেবদিগের ঘরে প্রতিদিন আমাকে যাইতে হয়, আজও সেইরূপ যাইতে হইবে—আর এই ৪০০০৲ টাকার বিষয় তাঁহাদিগকে জানাইতে হইবে !

কিন্তু এই টাকাটা কোথায় পাইব ? কোথা হইতে আসিবে ? আমার নিজের গাঁট হইতে ত দিতে পারি না ! প্রথমতঃ অত টাকা আমার নাই। খাই-খরচ বাদে যেমন-যেমন একটু টাকা বাঁচিয়াছে তাহাতে অমনি গবর্ণমেণ্ট-কাগজ খরিদ করিয়াছি। আমার যাহা কিছু আছে তাহা ১৫০০৲ কিম্বা ২০০০৲ টাকার বেশি হইবে না। বাকিটা অবশ্য ধার করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে আমি একেবারেই নিঃসম্বল হইয়া পড়ি। ঈশ্বর জানেন, এই যে দেড় দুই হাজার টাকা আছে, ইহা আমার কত পরিশ্রম ও কষ্টের ধন ! তা সব যাক্ ! আসল কথা, আজ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে ঐ ৪০০০৲ টাকাটা দিয়া তহবিল পূরণ করিয়া রাখিতেই হইবে। কিছু দিন পরে এই হিসাবের গোলটা আপনা হইতেই ধরা পড়িবে—তখন আমার টাকাটা ফিরিয়া লইব—এবং আমার ধারটাও শুধিয়া ফেলিব। আর যাই হোক্—আমার কাজটা ত থাকিবে। হাঁ—আর ইতস্ততঃ করিব না—ইহা ভিন্ন আর কিছুই করিবার নাই। আর এক মুহুর্ত্তও সময় নষ্ট করিলে চলিবে না। আমাদের আফিসের একজন উচ্চপদের চর্ম্মচারীকে আমার স্থানে বসাইয়া টাকা সংগ্রহ করিতে বাহির

হই এবং তাহাকে এই কথা বলিয়া যাই, যদি কেহ আমার কথা জিজ্ঞাসা করে, সে যেন বলে আমি কোন বিশেষ প্রয়োজনে বাহির হইয়াছি—এক ঘণ্টার অধিক বিলম্ব হইবে না।

একটা গাড়িতে আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া এক্স্চেঞ্জ অভিমুখে গমন করিলাম—যে দালাল আমার কাজকর্ম্ম করিয়া থাকে তাহাকে সেখানে পাইবার সম্ভাবনা মনে করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে, গবর্ণমেণ্ট-কাগজের রসিদগুলি আমার নিকটেই ছিল। তাহা না থাকিলে, একঘণ্টা আরও বিলম্ব হইয়া পড়িত—তাহা হইলে হয় ত সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইত। দালালকে আবশ্যকীয় উপদেশ দিয়া, যে বন্ধুর নিকট বাকি টাকা ধার করিব মনে করিয়াছিলাম তাহার নিকটে গেলাম। বন্ধু বাড়িতেই ছিলেন। কোন আপত্তি না করিয়া তিনি আমাকে টাকাটা দিলেন। আমার বুকের ভিতর হইতে যেন একটা পাষাণ-ভার নাবিয়া গেল। কোচ্মানকে বলিলাম যত শীঘ্র পার ব্যাঙ্কে চল!

এক্ষণে, হাতে নগদ টাকা রহিয়াছে—আর কোনও ভয় নাই, কেবল এই মনে হইতেছে পাছে আমার অনবস্থিতিকালের মধ্যে এই বিষয় কেহ জানিতে পারিয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত বড় সাহেব যদিও কখন আমার নগদ তহবিল দেখিতে চাহেন নাই, তবু কি জানি, যদি কোন ঘটনাক্রমে আজই তাঁহার তহবিল দেখিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে।

—"আমার কথা বড় সাহেব কি কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই?" গাড়ি হইতে নাবিয়াই আফিসের পেয়াদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

—"না, মহাশয়!"—পেয়াদা উত্তর করিল। আমার ব্যতিব্যস্ত ভাব দেখিয়া পেয়াদা একটু আশ্চর্য্য হইয়াছিল।

আমি তখন হাঁপ ছাড়িলাম এবং আমার দফ্তরখানায় প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাক্স খুলিলাম ও তাড়াতাড়ি তাহাতে ৪০০০৲ টাকা গুঁজিয়া দিলাম।

৬ টার সময়, বড় সাহেবের নিকট ক্যাস্‌বাক্স ও খাতাপত্র লইয়া গেলাম—তিনি একবার চোখ বুলাইয়া দেখিলেন, বলিলেন, "ঠিক্ আছে।" আমার উপর দিয়া যে ধাক্কাটা গিয়াছিল, স্বভাবতই তাহার কিছু-না-কিছু চিহ্ন আমার মুখে প্রকাশ হইবার কথা। বাড়ি আসিবামাত্রই, আমার চেহারার বৈলক্ষণ্য, আমার কম্পিত কণ্ঠস্বর দেখিয়া আমার স্ত্রী তখনই ধরিলেন।

—"তোমার একটা কি হয়েছে! বল দেখি, ব্যাপারটা কি?"

আমি একটা মিথ্যা কথা বলিব মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টির সম্মুখে আমি তাহা পারিয়া উঠিলাম না—আসল কথা সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলাম। আমার ভয় হইতেছিল পাছে মদলীনা আমাকে তিরস্কার করেন; আমার মনে হইতেছিল, তিনি বলিবেন, তুমি নিজে তহবিল তছ্‌রুপ কর নাই, তবে কেন তাড়াতাড়ি সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া সে ক্ষতিপূরণ করিতে গেলে? এতদিন কষ্টেস্ষ্টে আমরা যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তুমি ইচ্ছা করিয়া তাহা জলে ফেলিয়া দিলে। আর, যে বাস্তবিক চোর সে আপনার কোটরে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে।

কিন্তু সে সুশীলা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া, আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—

—তুমি ভালই করিয়াছ! সৎলোকের মতই ব্যবহার করিয়াছ—তুমি দেখিবে, পরে আসল কথা সমস্তই প্রকাশ পাইবে, ৬৭৭

আমাদের টাকাও আমরা ফিরিয়া পাইব। তা' ছাড়া, যদিও বা কিছু না হয়—৪০০০৲ টাকা নয় আমাদের গেল—আমরা ত খোলসা রহিলাম। আবার নয় পূর্ব্বের মত কিছুকাল খাটিতে হইবে, আর, যে সকল আমাদের সুখের কল্পনা আছে, তাহা নয় কিছুকালের মত পিছিয়া পড়িবে—এই বৈ তো নয়!

৪

তাহার পরদিন হইতে দস্তরমত কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলাম, যেন কিছুই হয় নাই এই ভাবে চলিতে লাগিলাম; আশা করিয়া রহিলাম, দৈবাৎ যদি কোন গতিকে রহস্যটা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা আর প্রকাশ হইল না—রহস্যটা যেরূপ দুর্ভেদ্য ছিল, সেইরূপই রহিয়া গেল। প্রায় হতাশ হইয়া পড়িয়াছি, এমন সময়ে পূর্ব্বাপেক্ষাও ভীষণতর আর এক বিপদ বজ্রাঘাতের ন্যায় আমার উপর আসিয়া পড়িল। যাহার পূর্ব্বে কোন সূচনা ছিল না, যাহার বিন্দুবিসর্গ সন্দেহ পর্য্যন্ত কাহারও মনে উদয় হয় নাই তাহাই হইল;—ব্যাঙ্কের একজন বড় সাহেব দেউলে হওয়ায়, ব্যাঙ্ক ফেল হইল।

এইবার আমার ৪০০০৲ টাকা জলে ডুবিল। ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে শুনিবামাত্র এই কথাটি আমার প্রথমেই মনে হইল। ব্যাঙ্কের পাওনাদারদিগের সহিত একটা রফা নিষ্পত্তি করিয়া যদি ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষেরা পাওনাদারদিগকে কিছু কিছু করিয়া দিয়া টাকা পরিশোধ করেন—আমি একজন পাওনাদার বলিয়া কি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতে পারি? আমার জিম্মায় তহবিল কমি হওয়ায় আমি নিজ হইতে তাহা পূরণ করিয়া রাখিয়াছি—আমি কি এখন পাওনাদার হিসাবে তাঁহাদের নিকট কিছু দাবি করিতে পারি? এই গোলযোগের সময় একটা দাঁও

পরিবার ফিকিরে আছি ইহা যদি তাঁহারা নাও বিশ্বাস করেন, অন্ততঃ আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিবেন।

আমার কর্ম্মটিও ত গেল, কিন্তু প্রথমেই সে কথাটা আমার বড় মনে আইসে নাই। একটা বড় ব্যাঙ্কে আমি তিন বৎসর ধরিয়া কর্ম্ম করিতেছি—আমার খাজাঞ্চিগিরি পদের দরুণ, কত লোকের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হইয়াছে—আমি কি এই রকম কাজ আর কোন স্থানে পাইতে পারিব না? তা'ছাড়া, এখন কোন তাড়াতাড়ি নাই, যতদিন রফা নিষ্পত্তি অনুসারে পরিশোধের কাজ চলিবে, ততদিন আমাকে না রাখিলে চলিবে না—আমি মাসে মাসে বেতন পাইতে থাকিব। কিন্তু এ সকল কথা আমার প্রথমে মনে আসে নাই।

যাহাই হউক, আমার আশামত ঠিক্ হইল না—পরিশোধের কাজ শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। আমার জবাব হইল। আমি রাস্তায় ভাসিলাম।

আমি আবার কর্ম্মের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলাম। কিন্তু কর্ম্ম পাওয়া যতটা সহজ ভাবিয়াছিলাম ততটা সহজ নহে। ও! কতই আশ্বাসবাক্য—কতই মিষ্টি কথা, তাহাতে কাহারও কার্পণ্য নাই। এই রকম ভাবে অনেকে বলিল, "আর এক দিন আসিয়া দেখা করিও—একটু অপেক্ষা কর, কাজকর্ম্মের আর একটু সুবিধা হোক্। তোমার কথা মনে রাখিব, একটু সবুর করিয়া থাকিতে হইবে।"

আমি ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলাম এবং যাহাদিগের সহিত পূর্ব্বে আলাপ পরিচয় ছিল তাহাদের নিকট প্রথমে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। তাহার পর, কাজের জন্য যাহাদিগের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলাম, তাহাদের নিকট গেলাম। দুই এক সপ্তাহের

জন্য কোথাও বা কাজ পাইলাম।—যতই দিন যায়, উচ্চপদের অভিমান ততই কমিয়া আসিতে লাগিল—মনে হইতে লাগিল, কাজ যতই সামান্য হোক্‌, বেতন যতই অল্প হোক্—আপাততঃ একটা কিছু পাইলে হয়। সেই সঙ্গে, আমাদের এখন যে সামান্য সংসার-খরচ তাহাও কমাইলাম। সৌভাগ্যক্রমে, মদলীনা তাহাতে কোন অসন্তোষ প্রকাশ বা প্রতিবাদ করিল না। সে পূর্ব্বের ন্যায় চিরপ্রফুল্ল ও চিরবিশ্বস্ত। তাহার অটল সাহসে আমিও সাহস পাইলাম।

তহবিলের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য আমি যে বন্ধুর নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলাম, তিনি একদিন সেই টাকা হঠাৎ আমার নিকট চাহিলেন। ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় তাঁহারও কিছু ক্ষতি হইয়াছিল। সেইজন্য, তাঁহার যেখানে যে বাবতে পাওনা আছে সমস্ত সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। আমি কিছু সময় লইবার চেষ্টা করিলাম, আপাততঃ আংশিক কিছু দিতেও স্বীকৃত হইলাম; কিন্তু আমার পাওনাদার বন্ধু কিছুই শুনিলেন না। এমন কি, তাঁহার কণ্ঠস্বরও কিঞ্চিৎ উচ্চগ্রামে উত্থিত হইল। আমার দুরবস্থার আধিক্য দেখিয়া তাঁহার ভয় হইয়াছিল, পাছে তাঁহার টাকা পরিশোধ না করি। কিন্তু আমার স্ত্রী প্রথমেই আমাকে পরামর্শ দেন, যাহাই অদৃষ্টে থাক্‌, উঁহার টাকা এখনি ফেলিয়া দেওয়া ভাল। এই উদ্দেশে টাকা সংগ্রহ করিতে হইলে, আমাদের সমস্ত জিনিষপত্র বিক্রয় করিতে হয়, যে বাসায় এখন আছি সে বাসা পরিত্যাগ করিতে হয়, ঝিকে ছাড়াইয়া দিতে হয়, এবং নিতান্ত হীন দরিদ্রকুটীরে গিয়া বাস করিতে হয়।

যা' হোক্‌, অনেক কষ্টে টাকাটা ত একরূপ সংগ্রহ করিলাম—সংগ্রহ করিলাম বটে, কিন্তু কতটা সুখের বিনিময়ে! স্বচ্ছল

অবস্থা হইতে, একেবারে রিক্ত-হস্ত হইলাম। এখন হইতে আমরা পথের ভিখারী—মুটে মজুরের অপেক্ষাও আমাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল।

যে সকল কাজ আমার পক্ষে লজ্জাজনক ও ঘৃণিত তাহাতে বাধ্য হইতে হইল—"বিল্" নকল করিয়া দিই—কিন্তু তাহার টাকা সহজে পাই না, অনেক খাঁচ্কাইয়া তবে আমার পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হই—কখন বা ভিক্ষাস্বরূপ অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া আদায় করি, কখনও বা অতি জঘন্য ময়লা সিঁড়ি বাহিয়া যত ওঁচা দালালদের ঘরে প্রবেশ করি। যতই কঠোর হউক্ না, যতই নীচ হউক্ না, কোন কাজেই পিছ্-পাও হই না।

ইহা সত্ত্বেও, আমার অবস্থা ক্রমশঃ আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল—দুঃখের যতপ্রকার ধাপ ছিল সকল ধাপগুলি বাহিয়া আমি দ্রুতগতি নাবিতে লাগিলাম। এক-প্রস্ত ছিন্ন পরিচ্ছদ, একটা অব্যবহার্য্য টুপি—গোড়ালি-দোম্ড়ানো এক জোড়া জুতা—ইহাই এক্ষণে আমার একমাত্র পরিধেয় হইল।

অবশেষে যাহা ছিল তাহাও ঘটিল। আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য কখনই ভাল ছিল না, এখন আরও খারাপ হইয়া উঠিল। সে সুশীলা বালা সমস্ত অম্লানবদনে সহ্য করিয়া আসিয়াছে—কখনও তাহার মুখে একটী হা-হুতাশ এক মুহূর্ত্তের জন্যও শুনা যায় নাই। খাওয়া-পরার কষ্ট, অস্বাস্থ্যকর ঘর, বায়ুর অভাব—ইহাতে শরীরে বল না থাকিলে কি করিয়া সহ্য হয়? পাছে আমি আরও হতাশ হই, পাছে আমার কষ্টের আরও বৃদ্ধি হয়, এই জন্য সে যতটা পারিত, আপনার অবস্থা আমার নিকটে ঢাকিবার চেষ্টা করিত, শরীরকে কোনও প্রকারে টানিয়া আনিয়া আমার নিকট খাড়া হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু এক দিন আর পারিয়া

উঠিল না—মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল—আহা! সেই যে পড়িল, শয্যা হইতে আর উঠিল না!

৫

মদলীনাকে ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে আর সাহস হয় না। সাংসারিক কাজের জন্য নিতান্ত আবশ্যক হইলে তবেই বাহির হইতাম এবং তখনই তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিতাম। ভয় হইত, পাছে আমার অনুপস্থিতিকালের মধ্যে তাহার পীড়া বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

আমাদের ভাল সময়ে একজন ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ ছিল, তিনি অনুগ্রহ করিয়া বিনা ভিজিটে আমার স্ত্রীকে দেখিতে আসিলেন এবং রোগীকে পরীক্ষা করিয়া আমাকে বলিলেন— —"কিছুই গুরুতর নহে, রক্তহীনতার লক্ষণমাত্র। তোমার স্ত্রীর জন্য এখন কেবল প্রয়োজন, ভাল বাতাস ও ভাল গরুর দুধ। কিয়ৎ সপ্তাহের জন্য, পল্লিগ্রাম অঞ্চলে রাখিয়া দিলে ভাল হয়। তাহা যদি না পার, তবে প্রতিদিন প্রাতে একবাটি করিয়া ভাল দুধ খাইতে দিবে। আমি যতদূর জানি, সহরেও বেশ ভাল দুধ পাওয়া যাইতে পারে। একজন ভাল গোয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলেই পাইতে পারিবে। আর কোন কষ্ট করিতে হইবে না।"

একজন ভাল গোয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলেই হইবে! কিন্তু তাতেও ত পয়সা চাই। বিশেষতঃ যে অবধি কাজের চেষ্টায় রাস্তায় বাহির হইতে পারি নাই, তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত যাহা ব্যয় হইয়াছে তাহাতেই আমি নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছি। নগরের দাতব্য আলয় হইতে যাহা কিছু পাইয়াছিলাম, তাহাতে দুই এক সপ্তাহ কোনপ্রকারে জীবন ধারণ করিয়াছিলাম;

তাহার পর আমাদের দুর্দশার আর শেষ নাই, দোকানদার খাদ্যসামগ্রী আর ধারে দিতে চাহে না। আর আমাদের বাসার লোকের কথা যদি বল, তাহারাও আমার ন্যায় হতভাগ্য দরিদ্র। মোট কথা, যে দিন ডাক্তার আসিয়া একবাটি দুধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন, আমার এমন একটি পয়সা নাই যে, তাহাতে আমি দুগ্ধ ক্রয় করি।

দুগ্ধ ক্রয় করিবার জন্য কি উপায়ে দুই তিন আনা সংগ্রহ করি, অনেক চিন্তা করিলাম—মাথামুণ্ডু খুঁড়িয়াও কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। হাত মোচ্‌ড়াইতে মোচ্‌ড়াইতে বলিয়া উঠিলাম, "এই তুচ্ছ দুই এক আনার অভাবে আমার মদলীনা মারা পড়িবে, আর আমি তাহা চক্ষে দেখিব!"

সে রাত্রিতে আর ঘুমাইলাম না—আমাদের এই হীনাবস্থা সম্বন্ধে মনে মনে নানাপ্রকার আন্দোলন করিতে লাগিলাম।

ভোরের বেলায়, একটা ঝন্‌ঝন্ শব্দ হঠাৎ আমার কানে পৌঁছিল। তখন চারিদিক নিস্তব্ধ, সকলেই নিদ্রিত—সেই সময়ে এই শব্দটা আরও যেন ভয়ানক বলিয়া মনে হইল। দেখিলাম, আমাদের বাসার লাগাও যে একটা দুধের দোকান আছে, সেই-খানে যোগান দিবার জন্য একজন গোয়ালা গাড়ি করিয়া দুধ আনিতেছে। তখনই একটা মৎলব আমার মনে আসিল। যদি গোয়ালাকে বলা যায়, এখন আমায় একটু দুধ দাও, ইহার মূল্য আমি কিছুদিন পরে দিব। আমি তাকে বুঝাইয়া বলিব, আমার স্ত্রী বেচারা অত্যন্ত পীড়িত, আমি তাহারই জন্য একটু দুধ চাহি-তেছি, দুগ্ধই তাহার একমাত্র আহার। এই পল্লীগ্রামের লোকেরা দুঃখ কাহাকে বলে তাহা জানে, বোধ হয় আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবে না।

আমার টেবিলের উপর একটা পাত্র ছিল, সেই পাত্রটা তাড়াতাড়ি হাতে করিয়া চারি চারি ধাপ এককালে ডিঙ্গাইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নাবিলাম। কিন্তু এত যে তাড়াতাড়ি নাবিয়া গেলাম, নীচে গিয়া দেখি গাড়িটা চলিয়া গিয়াছে। দূর হইতে দেখিলাম গাড়িটা, রাস্তায় মোড় ফিরিতেছে। পাত্রহস্তে, হত-বুদ্ধি হইয়া আমি সেইভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম—মদলীনাকে বাঁচাইবার যে একমাত্র উপায় আমার মনে আসিয়াছিল, তাহাও ফস্‌কাইয়া গেল।

এই সময়ে তিনটা বড় বড় টিনের বাক্স আমার নজরে পড়িল; আমাদের প্রতিবেশীর বাড়ির প্রবেশপথে, আমার দুই এক হাত আগে, সেই বাক্সগুলি রাখিয়া গোয়ালা চলিয়া গিয়াছিল।

আমি একটু ইতস্ততঃ না করিয়া, আমি সেখানে একাকী কিম্বা আর কেউ সেখানে আছে তাহা পর্য্যন্ত বিবেচনা না করিয়া একটা বাক্সের ঢাক্‌না খুলিলাম, খুলিয়া তাহা হইতে দুগ্ধ লইয়া আমার পাত্রটি পূর্ণ করিলাম, তাহার পর বাক্সের ঢাক্‌না বন্ধ করিয়া, চোরের মত পলায়ন করিলাম।

চোরের মত—হাঁ, চোরই বটে। চুরি, হাঁ চুরিই করিলাম! কিন্তু এ কথাটা সেই সময়ে মনে হইলেও থামিলাম না, আমি কেবল তখন মনে করিতে লাগিলাম, দুধটুকু পাইলে আমার মদলীনা কত না জানি খুসী হইবে এবং তাহাতে তাহার কত না উপকার হইবে। তা ছাড়া, গোয়ালাটা অত শীঘ্র চলিয়া গেল কেন, এ কেবল ধার লওয়া বৈ ত নয়, আমি ত চুরি করিব মনে করি নাই, আমি তাহার দুধের দাম দিব!

প্রথমে আমার একটু অনুতাপ হইয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিলাম, আমার স্ত্রী আগ্রহের সহিত দুধের বাটিটা লইল এবং ধীরে

ধীরে সমস্ত দুগ্ধ নিঃশেষে পান করিল এবং তাহার পরেই সস্মিত-মুখে শান্তভাবে আবার ঘুমাইয়া পড়িল, তখন আমার সে অনুতাপ কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল।

কেবল এখন এই ভয় হইতেছিল পাছে এ কথা কেহ জানিতে পায়। দুগ্ধ কতটা কমিয়াছে তাহা কে অত মনোযোগ করিয়া দেখিবে, আর, প্রতিদিনই যে, বাক্সগুলি দুধে ভরপূর থাকে তাহাও না হইতে পারে। যাহাই হউক্ আমাকে কি করিয়া সন্দেহ করিবে? দুগ্ধওয়ালা হয় ত আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানে না।

রাত্রি হইলে, আমি যখন খাদ্য সংগ্রহ করিবার জন্য মুদির দোকানে গিয়াছিলাম, তখনও আমার মনের আকুলতা যায় নাই, আমি ভয়ে ভয়ে সেই দোকানের পর্দ্দার মধ্য হইতে দুগ্ধওয়ালা কি করিতেছে উঁকি মারিয়া দেখিলাম—বোধ হইল, সে কিছুই টের পায় নাই।

তার পর দিন প্রাতে যখন আবার সেই গোয়ালা গাড়ি করিয়া দুগ্ধ লইয়া যাইতেছিল, আমি আবার তাড়াতাড়ি নীচে নাবিয়া গেলাম—কিন্তু এবারও ঠিক্ সময়ে পৌঁছিতে পারিলাম না; এবারও আমি সেই টিনের বাক্স হইতে দুধ লইয়া আমার পাত্র পূর্ণ করিলাম।

ধর্ম্মবুদ্ধির একবার পতন হইলে, কত শীঘ্র তাহা অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, মনে করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যে আমি, অতিমাত্র সততা করিতে গিয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিলাম, সেই আমি কি না দুই এক আনার তুচ্ছ দুগ্ধ চুরি করিয়া আনিতেছি। ইহা, কিছু দিন পূর্ব্বে, আমি নিজেই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। আমার আচরণ সমর্থন করিবার জন্য অশেষ যুক্তিপরম্পরা

আসিয়া উপস্থিত হইল। দুই এক আনার দুগ্ধ আত্মসাৎ করিয়া যদি মদলীনার প্রাণ বাঁচাইতে পারি, তাহাতে এমন কি দোষ হইতে পারে? দোকানদার যদি দুধের কমতি বুঝিতেই না পারিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার বিশেষ কি ক্ষতি হইয়াছে? আর, যদি কমিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হয়, সে খাঁটি জল দিয়া তাহা পূরণ করিয়া রাখিবে। দুধওয়ালারা ত সচরাচর এইরূপ করিয়াই থাকে।

হয় ত দুধওয়ালা জানিতে পারিয়াও ইচ্ছা করিয়া বলিতেছে না। খুব লোক ভাল বলিতে হইবে। আমার হাতে যখনই টাকা আসিবে, আমি তাহার দুধের মূল্য একশত গুণ ধরিয়া দিব। ইহা বড় আশ্চর্য্য, এক সপ্তাহ কাল এইরূপ কার্য্য চলিতেছে, অথচ দুধওয়ালা কিছুমাত্র সন্দেহ করিতেছে না।

ক্রমে আমার বিশ্বাস হইল যে, দুধওয়ালা ইচ্ছা করিয়া আমাকে দুধ লইয়া যাইতে দিতেছে। এই বিশ্বাস এতদূর বদ্ধমূল হইল যে, দুধ কতটা কমিয়া যাইতেছে সে বিষয়ে আর ভ্রূক্ষেপ করিলাম না।

পরদিন প্রাতে আবার যখন আমি এইরূপ টিনের বাক্সের ঢাক্‌না বন্ধ করিয়া দুধের পাত্রটি লইয়া বাড়ি ফিরিব, এমন সময়ে একটা হাত হঠাৎ আমার কাঁধের উপর স্থাপিত হইল এবং আমার কানের নিকট একটা মোটা আওয়াজ শুনিতে পাইয়া কাঁপিয়া উঠিলাম।

—"আ! এবার, বাছাধন, তোমাকে ধরেছি। আটদিন ধরে' তোমার কাণ্ড সব দেখ্‌ছি। আজ আর ছাড়ব না। চল থানায় চল, শীঘ্র চল।"

আমি তখন একেবারে বজ্রাহত। কোন কথা না বলিয়া,

কোন বাধা না দিয়া, নতশির হইয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম।

তাহার পর, মহাশয় কি হইল আপনি ত সব জানেন। আমি যে চুরি করিয়াছি, এ কথা এক মুহূর্তের জন্যও অস্বীকার করি নাই—আমি যে অপরাধী তাহা আমি জানি। তবে, কি জন্য ও কাহার জন্য আমি এই চুরি করিয়াছিলাম সমস্ত আপনার নিকট খুলিয়া বলিলাম—আমি কতটা অপরাধী ও কতটা কৃপা-পাত্র আপনি এক্ষণে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

(৬)

অশ্রুপূর্ণনেত্রে অপরাধী এই সমস্ত কথা বিবৃত করিল। বিচারক যিনি শুনিতেছিলেন, তিনি সহৃদয় ব্যক্তি। হতভাগ্য অপরাধীর মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া তিনি ব্যথিত ও বিচলিত হইলেন। এবং যতদূর পারেন, তাহার দিকে টানিয়া অনুকূল ভাবে বিচার করিতে লাগিলেন। তাহার অধিক আর তিনি কি করিতে পারেন? অপরাধী অপরাধ স্বীকার করিতেছে, অপরাধও গুরুতর, আইনও অকাট্য। সুতরাং, যতদূর কম শাস্তি হইতে পারে, অপরাধীর তিন মাসের ফাটক হইল।

যে দিন এই দণ্ডাজ্ঞা হইল, সেইদিন রাত্রে কারারক্ষক অপরাধীর কারাগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, জানলার গরাদে কাপড় লট্‌কাইয়া বেচারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শয্যার পাদ-দেশে পেন্‌সিলে লেখা একটা কাগজ পড়িয়া ছিল, রক্ষক দেখিতে পাইল। এইরূপ লেখা আছেঃ—

"মানুষের নির্দয় বিচার! আমি হতভাগ্য বৈ আর কিছুই নই, কিন্তু আমার প্রতি চোরের ন্যায় ব্যবহার করিল। ইহা ঠিক্ নহে। আমি গৃহে আর ফিরিতে পারিব না—তাহা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল।"

বেচারা হয় ত মনে করিয়াছিল, এ অপমানের কথা শুনিলে তাহার স্ত্রী আর প্রাণ রাখিবে না—তাই সে আত্মঘাতী হইল।

ফলতঃ বিচারক মনে করিয়াছিলেন তাহার স্ত্রীর নিকট তিনি নিজে গিয়া তাহার এই বিপদের কথা অতি সন্তর্পণে ব্যক্ত করিবেন এবং তাহার সাহায্যার্থে কিছু বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিবেন—কিন্তু তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া জানিলেন, এক দিন পূর্ব্বে তাহারও মৃত্যু হইয়াছে।

দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইবার এক ঘন্টা পূর্ব্বে সে ইহলীলা সম্বরণ করে।

মানুষের বিচার এইরূপ! একটি আঘাতে স্ত্রীপুরুষ উভয়েই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল। এবং কিসের জন্য?

——এক বাটি দুধের জন্য।

সার সংগ্রহ।

মোগল রাজপত্নী।

মুসলমান বাদসাহারা ভারতের উপর অন্যূন সাত আট শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন, ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছু নহে কেবল এইমাত্র যে, কয়েক জন মুসলমান বাদসা' এই দেশে বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। মোগলেরা যে, এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন ইহাই তাহার প্রধান কারণ। আকবর প্রথম দৃষ্টান্ত দেখান। সেই দৃষ্টান্ত তাঁহার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রেরা সকলেই অনুকরণ করিয়াছিলেন। সেদিন ইতিহাস পড়িতে পড়িতে কোন্

বাদসা কাহাকে কাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ইহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে আমাদিগের ইচ্ছা হইল। সেই তালিকাটি আমার নিম্নে প্রদান করিতেছি। ইহা হইতে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, মুসলমান বাদসাদিগের একটি সুবিধা ছিল যাহা ইংরাজদিগের নাই। তাঁহারা অনেকগুলি বিবাহ করিতে পারিতেন। সুতরাং একজন বাদসাই এক জাল দিয়া অনেক মৎস্য ধরিতে পারিতেন; অর্থাৎ একজন বাদসাই অনেকগুলি বড় বড় হিন্দু রাজাদিগকে আপনার লোক করিয়া ফেলিতেন। ইহাতে যে দেশসুদ্ধ লোক তাঁহাদিগের অনুগত হইয়াছিল তাহার আর আশ্চর্য্য কি।

আক্‌বর সর্ব্বসুদ্ধ আটটি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীগণের নাম নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে :—

১। সুলতান রাকিয়া বেগম। ইনি ৮৪ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিতা ছিলেন। ইহাঁর কোন সন্তান ছিল না। ইনি সাহাজিহানকে মানুষ করিয়াছিলেন।

২। সুলতান সালিমা বেগম। বৈরামখাঁর পত্নী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর আক্‌বর তাঁহাকে বিবাহ করেন।

৩। জয়পুরের মহারাজা বিহারীমলের কন্যা এবং মহারাজা ভগবান দাসের ভগ্নী।

৪। আবদুল ওয়াসীর সুন্দরী পত্নী।

৫। যোধবাই। যোধপুর মহারাজার কন্যা। ইহাঁর পুত্রের নাম জেহাঙ্গির। কিন্তু কোন মুসলমান ইতিহাসে ইহাঁর নামের উল্লেখ নাই। একজন লেখক বলিতেছেন—"আমাদিগের আশা এই যে, যোধবাই মৃত্যুর পর স্বর্গে স্থান পাইবেন। জেহাঙ্গিরের মাতা হিন্দু। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার নরকে যাওয়া উচিত নহে।"

মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে কাফের বলিয়া জানে। সুতরাং তাহারা নরক ভিন্ন অন্য কোন স্থানের অধিকারী নহে। কিন্তু ব্লকম্যান সাহেব বলেন যে, যোধবাই আকবরের পত্নী ছিলেন না। তিনি জেহাঙ্গিরের রাজমহিষী ছিলেন। জেহাঙ্গিরের মাতা মহারাজা বিহারীমলের কন্যা।

৬। বিবি দৌলৎ শাদ।

৭। আবদুল্লা খাঁ মোগলের কন্যা।

৮। খাণ্ডেস্ প্রদেশের মিরণ মোবারক সাহার কন্যা।

আকবরের পাঁচ পুত্র এবং তিন কন্যা ছিল। জেহাঙ্গিরের অন্যূন ২৩টি বিবাহ ছিল। এই সকল পত্নীদিগের মধ্যে সাত জন হিন্দুরাজকন্যা। তাঁহাদিগের নাম দিতেছি।——

১। জয়পুরের রাজা ভগবান দাসের কন্যা। তাঁহার একটি কন্যা এবং একটি পুত্র জন্মে। কন্যার নাম সুলতাহুন্নিসা বেগম, এবং পুত্রের নাম খস্রু। ইনি বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

২। বিকানিরের রাজা রায় কল্যাণমলের পুত্র রায় রাজ-সিংহের কন্যা।

৩। রাজা মালদেবের পুত্র উদয়সিংহের কন্যা। ইহাঁকে লোকে জগৎ গোঁসাইনী বলিয়া ডাকিত। ইনি বিখ্যাত সাহা-জেহানের মাতা।

৪। রাটোরের রাজা কেশবদাসের কন্যা। বাবার বহু বেগম বলিয়া তাঁহার এক কন্যা ছিল।

৫। মানসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎসিংহের কন্যা।

৬। জেসলমিরের রাওল ভীমের কন্যা। তাঁহাকে মালিকাই জেহান বলিয়া ডাকিত।

৭। রামচাঁদ বন্দেলার কন্যা।

জেহাঙ্গিরের পাঁচ পুত্র এবং দুই কন্যার নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অন্য অনেকগুলি পুত্রকন্যা ছিল। তাঁহাদিগের নাম কোথাও উল্লিখিত নাই।

অহিফেণ।

অহিফেণ কথাটা আপাততঃ সংস্কৃত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা সংস্কৃত নহে, এবং অহিফেণ বলিয়া যে পদার্থটা আছে তাহাও ভারতের নহে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহা ঔষধ বলিয়া গ্রীক্‌দিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাহার পর আরবেরা গ্রীক্‌দিগের নিকট হইতে ইহার ব্যবহার শিক্ষা করিয়া পারস্য এবং ভারতবর্ষে উহা প্রচার করে। ইহার গ্রীক্ নাম ওপিয়ন্। আরবেরা ইহাকে আর্ফিউম্ করিয়া লইল এবং এদেশের বৈদ্যেরা অহিফেণ বলিয়া ইহার নামকরণ করিল। আর্ফিউমের অনেকগুলি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গুণ ছিল বলিয়া ইহা দেশীয় চিকিৎসকদিগের নিকট অতিশয় আদরে গৃহীত হইয়াছিল। আক্‌বরের সময় রাজপুতদিগের মধ্যে ইহার ব্যবহার সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা ইতিহাসপাঠে জানা যায়। কিন্তু মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে এদেশে অহিফেণের নাম কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। যাঁহারা বলেন যে, ইহা একটি দৈব ঔষধ তাঁহারা না পড়িয়া পণ্ডিত। যে হেতু চরক এবং সুশ্রুতে ইহার নামগন্ধও পাওয়া যায় না। অন্যূন সাত আট শত বৎসর ধরিয়া অহিফেণ এখানে ঔষধ বা মাদক বলিয়া প্রচলিত আছে। সুরা, গাঁজা, চরস, সিদ্ধি এ সকল ভারতজাত,

ইহা নিরাপদে বলা যাইতে পারে। কিন্তু অহিফেন বিজাতীয় পদার্থ। ইহার প্রতি আমাদিগের অধিক মায়া জন্মাইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। স্বর্গে দেবগণ সুরা পান করিতেন, মহাদেব স্বয়ং ধূমপান করিতেন এ কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু কে কবে কোন্ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইন্দ্র, কি মহাদেব, কি কৃষ্ণ, কি বলদেব অহিফেণ সেবন করিয়া ভোঁ হইয়া থাকিতেন? ইউরোপীয় সুরা ম্লেচ্ছজাতিদ্বারা প্রস্তুত বলিয়া প্রকৃত হিন্দুরা তাহা পান করেন না। তবে অহিফেণকে তাঁহারা এত আদর করেন কেন?

বাস্তবিক কথা এই যে, কতকগুলি প্রদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে অহিফেণ জাতীয় ঔষধ বা মাদক বলিয়া গৃহীত হয় নাই। রাজপুত, শিখ, আসামী এবং উড়িষ্যানিবাসী ব্যতীত আর কোন জাতি ইহাকে উদারভাবে গ্রহণ করে নাই। তবে কেন অহিফেণ লইয়া আজকাল হিন্দুসমাজে এত তর্ক উপস্থিত হইয়াছে।

অহিফেণের ব্যবসা উঠাইয়া দিবার জন্য সম্প্রতি বিলাত হইতে এক প্রস্তাব আসিয়াছে। তজ্জন্য একটি কমিশনও বসিয়াছে। এই অহিফেণ হইতে আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের প্রচুর অর্থলাভ হইয়া থাকে। রাজপুরুষেরা ইহার চাষ করান্, শস্য হইতে অহিফেণের সারাংশ গ্রহণ করেন, এবং তাহার পর যে বস্তু প্রস্তুত হয় তাহা চীনদেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। চীনবাসীরা অহিফেণকে অতিশয় আদর করে। তাহার কারণ আছে। অনেক বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজেরা এই দ্রব্য চীনদেশে পাঠাইতেন। তখন সে দেশের লোকেরা ইহাকে এত ঘৃণা

করিত যে, তাহারা কোন মতে ইহাকে দেশে প্রবেশ করিতে দিতে চাহিত না। একবার এমন হইল যে, তাহারা কতকগুলা অহি-ফেণের সিন্ধুক নষ্ট করিয়া ফেলে। এত বড় আস্পর্দ্ধা দেখিয়া ইংরাজেরা চীনের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দুইবার ক্রমান্বয়ে এইরূপ যুদ্ধ হইলে অবশেষে চীন বেচারারা পরাভব স্বীকার করিয়া ইংরাজপ্রেরিত অহিফেণ লইতে বাধ্য হয়। তাহাদিগের সঙ্গে যে সন্ধিপত্র লিখিত হয় তাহাতে ইংরাজেরা অহিফেণ পাঠাইবে এবং চীনেরা তাহা গ্রহণ করিবে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ ছিল। সেই দিন হইতে চীনদেশে অহিফেন সেবনের ঘটা আরম্ভ হয়, সেই দিন হইতে ঐ দেশের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়। কাহারও কিছু বলিবার ক্ষমতা নাই। খৃষ্টধর্ম্মপ্রভাবে এক পরাক্রান্ত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী জাতি কেবল তরবারি, গোলা-গুলির সহায় লইয়া একটি সমগ্র জাতিকে উচ্ছন্ন করিতে পারেন ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত কেবল ইংরাজেরা দেখাইতে পারিয়াছেন। অথচ কে কি বলিতে পারেন? এই ব্যবসা হইতে গবর্ণমেণ্টের অন্যূন পাঁচ কোটি টাকা বাৎসরিক লাভ হয়। ইহা ভারতবর্ষের একটি বৃহৎ আয়ের মূল। এখন যদি এই ব্যবসা উঠিয়া যায়, তাহা হইলে এই পাঁচ কোটি টাকা কোথা হইতে আসিবে? গবর্ণ-মেণ্ট নিজেই উত্তর দিতেছেন—ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া। আমাদের দেশীয় লোকেরা এই কথা শুনিয়া মহাভীত হইয়াছেন। সুতরাং অহিফেণ ভগবানপ্রদত্ত, ইহা সর্ব্বব্যাধিনাশক,—ইহা চির-যৌবন দান করে, মৃত্যুকে বিনাশ করে, মূর্খকে জ্ঞানী করে, নির্দ্ধনকে ধনী করে, এই সকল কথা তাঁহারা ঐকতানিক সুরে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জিজ্ঞাস্য এই—অহিফেণ ভাল কি মন্দ? ইহার উত্তর কেবল ধান ভানিতে শিবের গীত।

Wanting pages 191 to 196

পাঁচ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ কি প্রকারে হইবে আমরা এ কথার কোন উত্তর দিতে চাহি না। গবর্ণমেণ্টে এত দিগ্‌গজ পণ্ডিত থাকিতে আমরা কেন ও কথার মীমাংসা করিতে যাইব? আমাদিগের কেবল এই জিজ্ঞাস্য অহিফেণ হইতে ভাল ফল উৎপন্ন হয় কি না? এই প্রশ্নটির উত্তর দিয়াই আমরা নিশ্চিন্ত থাকিব। যদি ভাল ফল উৎপন্ন হয়, ভালই। নচেৎ ইহার পক্ষ সমর্থন করিয়া আমাদিগের কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। অহিফেণের দুইপ্রকার ব্যবহার আছে—একটি ঔষধ বলিয়া, আর একটি মাদক বলিয়া। আবার মাদক বলিয়া ইহা দুই প্রকারে সেবিত হয়—প্রথমতঃ ভক্ষণ করিয়া, দ্বিতীয়তঃ ধূমপান করিয়া। ঔষধরূপ অহিফেণের অনেকগুলি উপকার লক্ষিত হয়। উদরের রোগ, বহুমূত্র প্রভৃতি ব্যাধিতে ইহার মত ঔষধ আর নাই। কিন্তু মাদক বলিয়া কি ইহার কোন গুণ আছে? কেহ কেহ বলেন যে, সুরাপান অপেক্ষা অহিফেণ সেবন অনেক গুণে ভাল। একথা শুনিলে আমাদের হাসি আসে। কেহ কি কখন বলেন যে, জলে ডুবিয়া মরা অপেক্ষা গলায় দড়ি দিয়া মরা লক্ষ গুণে ভাল? আমরা বলিব যে, দুইই মন্দ। ইহাদিগের মধ্যে তারতম্য নাই। কেহ কি জিজ্ঞাসা করেন—গলায় দড়ি দিতে গেলে নারিকেলের ছোবড়ানির্ম্মিত রজ্জু ব্যবহার করা ভাল, না অতিসূক্ষ্ম রেশমবোনা দড়ি ভাল? আমাদের উত্তর এই যে, মরণ। দুয়েতেই সমান। ইহাতে ভালমন্দের বিচার নাই। যদি নেশা করাটাই মন্দ হয়, তাহা হইলে সুরাপান যেমন মন্দ, অহিফেণ সেবনও ততটা মন্দ। পাপের আবার তারতম্য কি? এখন দেখিতে হইবে যে, অহিফেণ অনিষ্টকর কি না। আমরা বলি যে, ইহাতে যথেষ্ট অনিষ্ট হয়। কিঞ্চিৎ অ ক পরি-

সাধনা।

বুদ্ধদেবের পর্য্যটন এবং শিক্ষারম্ভ।

(বুদ্ধচরিত।)

সিদ্ধার্থ এখন একা হইলেন। পৃথিবীতে তাঁহার আর কেহ রহিল না। যত চলিলেন—সংসার, গৃহ, পরিবার, বন্ধুবান্ধব সকলই দূরতর হইতে লাগিল। উনত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। বিলাস, সম্ভোগ যাহা কিছু হইবার ছিল সকলই তাঁহার হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রকার সুখ আস্বাদন করিয়া শেষে সকল সুখকে নীরস বলিয়া তিনি অগ্রাহ্য করিলেন। সংসারে শান্তি নাই, এইজন্য তিনি এখন প্রকৃত শান্তির অনুসন্ধানে নির্গত হইলেন। কি জানি তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন কি না! তবে তিনি পৃথিবীতে একটা নূতন কার্য্য করিবেন এই সম্বন্ধে তাঁহার মনে একটা ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসে উত্তেজিত হইয়া তিনি চলিলেন। কোথায় চলিতেছেন, কোথায় যাইবেন, কিছুই জানেন না; কেবল বেগে চলিতে লাগিলেন। সাত দিন তিনি একটি আম্রবনে কাটাইয়াছিলেন। তথায় তিনটী আশ্রম ছিল। তৃতীয় আশ্রমটি রৈবত ঋষির আশ্রম বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই তিন স্থানেই তিনি যথেষ্ট সমাদর পাইয়াছিলেন।

সাত দিনের পর তিনি বৈশালী নগরে উপস্থিত হন। পাটলীপুত্রের অপর পারে যে স্থান ছিল তাহাকে এখন হাজিপুর বলে। সেইস্থান হইতে কিঞ্চিৎ উত্তরপূর্ব্ব দিকে দশ ক্রোশ গমন করিলে বৈশালীতে পৌছান যাইত। বৈশালী এখন একটিমাত্র গ্রাম, তাহার এখনকার নাম বিশাড়। ইহা হিরণ্যবতী নদীর উপরে স্থিত *। বৈশালীতে আরাড়কালাম বলিয়া একজন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তাঁহার আশ্রমে বুদ্ধদেব আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই ঋষির তিন শত শিষ্য ছিল দেখিয়া সিদ্ধার্থ তাঁহার নিকট শিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, আরাড়কালাম প্রকৃত মোক্ষের বিষয় নিতান্ত অনভিজ্ঞ, তখন তিনি আর তাঁহার নিকট থাকিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ তিনি শুনিতে পাইলেন যে, বৈশালী কপিলবস্তু হইতে দ্বাদশ যোজন, অর্থাৎ ৪২ ক্রোশ দূরে। তখন তিনি ভাবিলেন—"এস্থান কপিলবস্তুর অতি নিকটে। এখানে আমার থাকা উচিত নহে। শাক্যেরা আমার সমাচার পাইয়া নিশ্চয়ই এখানে আসিয়া আমাকে গৃহে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিবে। অতএব গঙ্গা পার হইয়া রাজগৃহাভিমুখে গমন করা উচিত।" এই বলিয়া তিনি দশ ক্রোশ পদব্রজে গমন করিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। তখন পাটলীপুত্র নগর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। গঙ্গা পার হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে গমন করিতে করিতে অবশেষে মগধের রাজধানী রাজগৃহে উপস্থিত হইলেন।

রাজগৃহ অতিশয় পুরাতন নগর। মহাভারতে ইহা গিরিব্রজ নামে উল্লিখিত আছে। ইহা জরাসন্ধ রাজার রাজধানী

* হিরণ্যবতীর এখনকার নাম গণ্ডক।

ছিল এবং এই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে সঙ্গে লইয়া জরাসন্ধকে মৃত্যুসদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই জরাসন্ধের রাজভবনের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। রাজগৃহকে পাঁচটি পর্ব্বতমালা প্রাচীরের ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে। ইহাদিগের নাম বৈভারগিরি, বিপুলগিরি, রত্নগিরি, উদয়গিরি এবং সোনগিরি। * নগরের চারিদিকে প্রস্তরময় প্রাচীরসকল নির্ম্মিত ছিল এবং উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম দিকে চারিটি প্রবেশদ্বার ছিল। ইহাদিগের অন্তর্গত একটি দুর্গও ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। বিপুলগিরির পদতল দিয়া সরস্বতি বলিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইত। সমুদয় স্থানটি অতিশয় মনোহর। চারিদিকে প্রকৃতির শোভা এবং পর্ব্বতমালার ভিতরে অগণ্য গুহা যেন প্রকৃতি নিজহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই সকল গুহার মধ্যে অসংখ্য ঋষি বাস করিতেন। স্থানটি দেখিতে যেমন সুন্দর ছিল,চতুঃপার্শ্বস্থ পর্ব্বতশ্রেণীসকল তেমনি দুর্গম এবং হিংস্র জন্তুদিগের নিবাসভূমি ছিল। নগরের পূর্ব্বদিকস্থ রত্নগিরি হইতে পাণ্ডবগিরি বলিয়া একটি শাখা চলিয়া গিয়াছিল। তাহার মধ্যস্থিত একটি গুহার মধ্যে সিদ্ধার্থ আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া অবশেষে কমণ্ডলু ধারণ করিয়া সিদ্ধার্থ পূর্ব্বদ্বার দিয়া নগরে ভিক্ষা করিতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই নরনারীগণ চমকিত হইল। এমন সুন্দরমূর্ত্তি, অল্পবয়স্ক যুবা সংসার ত্যাগ করিয়া, পিতামাতাকে কাঁদাইয়া, সন্ন্যাস লইয়াছেন—ইনি কে? ইনি কি ইন্দ্র, না অন্য কোন

---

* মহাভারতে এই সকল পর্ব্বতমালা বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি, এবং চৈত্যক বলিয়া উল্লিখিত আছে।

দেব মনুষ্য-আকার ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যে আগমন করিয়াছেন? লোকপরম্পরায় এইরূপ বলাবলি হইতে হইতে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা রাজা বিম্বিসারের কর্ণে প্রবেশ করিল। বিম্বিসার সিদ্ধার্থের সমবয়স্ক ছিলেন। † তিনি তৎক্ষণাৎ রাজভবনের ছাদ হইতে নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিলেন। সিদ্ধার্থের রাজলক্ষণ-সকল দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন। একজন ভৃত্যের হস্তে ভিক্ষাদ্রব্য দিয়া তিনি তাহাকে সিদ্ধার্থের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং সন্ন্যাসী কোথায় গমন করেন এবং কি করেন ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত আনয়ন করিবার আজ্ঞা দিলেন।

সিদ্ধার্থ দ্বারে দ্বারে পর্য্যটন করিয়া ভিক্ষার সমুদয় পদার্থ প্রাপ্ত হইলে নগরের পূর্ব্বদ্বার দিয়া নিক্রমণ করিয়া অবশেষে পাণ্ডব-গিরির গুহা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া আহারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তৎপরে ভোজনে বসিয়া দেখিলেন যে, স্বহস্তে যে অন্ন পাক করিয়াছিলেন তাহা গ্রাস করিতে রুচি নাই। এতদিন আশ্রমে থাকিয়া অন্যের হস্তে প্রস্তুত যে সকল খাদ্য তাহাই আহার করিয়াছিলেন। আজ তিনি স্বহস্তে পাক করিলেন। সেই রাজকুমারের আহার আর এই সন্ন্যাসীর প্রথম আহার—কত প্রভেদ! ভিক্ষাদ্রব্য যতদূর মন্দ হইতে পারে তাহা হইয়াছিল। সে দ্রব্য আহার করিতে তাঁহার রুচি হইবে কেন? অন্ন আর উদরস্থ হইল না। ইহা দেখিয়া তাঁহার কষ্ট এবং ভয়ও হইল—পাছে বা তাঁহাকে সংসারে ফিরিতে হয়। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে তাঁহার মনে কোথা হইতে এক দৈববল আসিয়া উপস্থিত হইল।

† এই কয়েক জন রাজা বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন—মগধরাজ বিম্বিসার, শ্রাবস্তিরাজ প্রসেনাজিত, কৌশাম্বিরাজ উদয়ান এবং উজ্জয়িনীরাজ প্রদ্যোত।

তিনি লজ্জিত হইলেন এবং বলিলেন—"আমি ভিক্ষুকের ব্যবসা লইয়া ভিক্ষুকের খাদ্যকে অবমাননা করিতেছি! ইহাই যে, এখন হইতে আমার নিত্য আহার হইল। ইহাতে অরুচি হইলে কি হইবে! সুখ, সম্ভোগ, বিলাস, তোমরা দূর হও। মাংসপিণ্ডের প্রবৃত্তিগুলিকে আমি একেবারে পদদ্বারা দলন করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি ভোজনপাত্র টানিয়া লইলেন। আর সে ঘৃণা রহিল না। এবার খাদ্যগুলি অতিশয় মিষ্ট বলিয়া বোধ হইল। সেই দিন হইতে তিনি খাদ্যদ্রব্যকে আর ঘৃণা করিতেন না।

বিম্বিসারের ভৃত্যগণ এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া রাজভবনে প্রত্যাগমন করিয়া মহারাজকে সকল কথা নিবেদন করিল। রাজা তৎক্ষণাৎ রথারোহণপূর্ব্বক অনুচরবর্গকে সঙ্গে লইয়া পাণ্ডবগিরিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে সিদ্ধার্থকে দেখিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং তাঁহার নিকটে গিয়া বিনীতভাবে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। সিদ্ধার্থের শান্তমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি একেবারে অবাক্। পরে ভাবের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে মহাত্মন্, আপনার রূপ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, আপনি সামান্য লোক নহেন। আপনার শরীরে সমগ্র রাজলক্ষণ বর্ত্তমান। আপনি কে, কোন্ দেশের লোক, কোন্ উচ্চ বংশ হইতে উদ্ভূত, এ সকল বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি।" সিদ্ধার্থ বলিলেন—"মহারাজ, হিমালয়শ্রেণীর অনতিদূরে কোশল বলিয়া এক সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেশ আছে। তথায় শাক্য বলিয়া এক জাতি আছে। তাহারা সূর্য্যবংশীয়, ইক্ষ্বাকু তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের নাম। আমি সেই জাতির লোক এবং আমার

জন্ম রাজবংশে। কিন্তু আমি সংসারের বন্ধন কাটিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি।” বিম্বিসার বলিলেন—“আপনার বিষয় আমি যথাক্রমে জ্ঞাত হইয়াছি। আপনি শুদ্ধোদন রাজার পুত্র সিদ্ধার্থ। আপনি চারিটি দৃশ্য দেখিয়া বুদ্ধ হইবার মানসে দেশবিদেশে পর্য্যটন করিতেছেন। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আপনি আর অধিক ভ্রমণ না করিয়া এই স্থানে সাধনা করুন। কিম্বা তাহা যদি আপনার অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে আমার ইহাও অনুরোধ যে, আপনি যখন দেবকৃপায় সিদ্ধ হইয়া বুদ্ধপদ প্রাপ্ত হইবেন, তখন যেন আমার উপর কৃপা করিয়া প্রথমেই রাজগৃহে পদধূলি দান করেন।” সিদ্ধার্থ এই কথায় সম্মত হইয়া পাণ্ডবগিরি ত্যাগ করিয়া রাজগৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

রাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া তিনি গৃধ্রকূট পর্ব্বত অভিমুখে গমন করিলেন। সেখানে তিনি প্রকৃত ঋষিদিগের আশ্রম দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন যে, সেই সকল ঋষি ও ব্রহ্মচারীরা ঘোর তপস্যাচরণে সদানিযুক্ত। কেহ দিবারাত্র ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কঠোর সাধনে নিমগ্ন—হস্তদ্বয় বিকল হইয়া গিয়াছে, তাহারা আর কার্য্য করে না। কেহ অগ্নি দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ভয়ঙ্কর উত্তাপের মধ্যে তপস্তা করিতেছেন। হস্ত-মুষ্টি বহুদিন বদ্ধ রাখাতে কাহারও অঙ্গুলীর নখগুলি হস্ত-চ্ছেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কেহ শাণিত লৌহ দ্বারা অঙ্গবিদ্ধ করিয়া শরীরকে নানাপ্রকারে নিপীড়িত করিতেছেন। কেহ কর্দ্দম ও ভস্ম দিয়া অঙ্গসমূহকে লেপন করিয়া রাখিয়াছেন এবং শ্মশানের ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া জীবনের অনিত্যতার পরিচয় দিতেছেন। কেহ বা জলমগ্ন হইয়া কেবল চক্ষুদ্বয় জলের উপর রাখিয়া ঘোর তপস্যাতে নিযুক্ত আছেন। কেহ দ্বিপ্রহর

বেলায় গণনা করিয়া সহস্র তণ্ডুলকণা ভক্ষণ করেন। কেহ বা আহারের সহিত অতিশয় তিক্তরস মিশ্রিত করিয়া আহার করেন। কেহ বা দর্শনসুখ না হয় বলিয়া চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছেন, মন্দ কথা না কহিতে হয় বলিয়া রসনাকে কাটিয়া ফেলিয়াছেন এবং বিলাস বাসনা একেবারে বিনষ্ট হইবে বলিয়া অন্যান্য নানাপ্রকার অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। সিদ্ধার্থ ইহাঁদিগেরই নিকট শরণাগত হইলেন, ইঁহাদিগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া সেইরূপ ব্যবহারে উন্মত্ত হইলেন। তাঁহার আগ্রহ, কষ্টস্বীকার, সহিষ্ণুতা ও সাধনের তীব্রতা দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে মহাশ্রমণ বলিয়া অভিহিত হইলেন। কিন্তু এইরূপ উগ্র তপস্যা করিয়াও তিনি যাহা চাহিতেছিলেন তাহা পাইলেন না। এই সকল ঋষিদিগের মধ্যে এই ধারণা ছিল যে, নানামতে শরীরকে উৎপীড়ন করিলে আত্মা স্বাধীন হইয়া অবশেষে নিজধামে গমন করিবে। আত্মার নিজধাম কোথা? দেবলোকে। এখানে কামনা বিনাশ করিলে সেখানে দ্বিগুণ কামনার অগ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং এখানে সুখসমূহ হইতে বঞ্চিত হইলে সেখানে সহস্র সুখের অধিকারী হওয়া যায়। পুণ্যবান্ আত্মা ব্রহ্মত্ব বা ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতরূপে সুখী হয়। সিদ্ধার্থ বুঝিলেন যে, তবে লোকে স্বর্গে কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য পৃথিবীতে কামনার নির্ব্বাণ করে। যদি পরলোকে কামনাই থাকিল, তবে কামনার ফল এই যে সকল দুঃখ ইহারাও ত রহিল? তাহা হইলে দুঃখের বিনাশ কিরূপে সম্ভব? তিনি পৃথিবীতে দুঃখের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া সংসার পরিত্যাগ করিলেন। যাহাতে দুঃখ একেবারে যায় ইহারই সাধনমানসে তিনি

দেশবিদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। কিন্তু ভ্রান্ত মনুষ্য সেই দুঃখকে বিনাশ করিতে গিয়া দুঃখের কারণ যে কামনা, তাহা যাহাতে অনন্তকাল চরিতার্থ হয় ইহারই চেষ্টা করে।

সিদ্ধার্থ আর সেখানে রহিলেন না। ঋষিদিগের নিকট বিদায় লইয়া পথিমধ্যে রামপুত্র রুদ্রক বলিয়া একজন ঋষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রামপুত্র বহুসংখ্যক শিষ্য সমভিব্যাহারে লইয়া রাজগৃহ হইতে অন্য দেশাভিমুখে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি বহুশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, অতএব তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে সিদ্ধার্থ যাহা চাহিতেছিলেন তাহা পাইতে পারেন এই মনে করিয়া তিনি রুদ্রকের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইহাঁর নিকট যাহা পাইবার তাহা তিনি পাইলেন। কিন্তু তিনি যে বিষয়ে আলোকপ্রার্থী ছিলেন সে বিষয়ে দেখিলেন রুদ্রক নিতান্ত অজ্ঞ। তাঁহার রুদ্রকের সহিত অনেক বিচার ও তর্ক হইল। কিন্তু তিনি কিছুতেই সন্তুষ্ট হইলেন না। অবশেষে তিনি বলিয়া উঠিলেন—"আমি এখন একা সাধন করিব। কঠোর তপশ্চরণে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিকে পেষণ করিয়া মনকে বাসনার অগ্নি হইতে নিবৃত্ত করিব। সংসারের সকল পদার্থই ক্ষণভঙ্গুর, এমন কি আত্মা পর্য্যন্ত অনিত্য, যাহা দেখি তাহা পরিবর্ত্তনশীল, আসিতেছে যাইতেছে। রূপরূপান্তর ধারণ করিয়া যুগে যুগে কেবল অসারতারই পরিচয় দিতেছে। মনকে এইরূপ চিন্তায় অভ্যস্ত করাইলে নিশ্চয়ই সে অবশেষে অনিত্য পদার্থকে অতিক্রম করিয়া নিষ্কাম রাজ্যের অধিকারী হইবে। আমি সেই সাধন করিতে চাই। অতএব কোন নির্জ্জন গহনে গমন করা আমার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।"

রুদ্রকের যে সকল শিষ্য ছিল তাহাদিগের মধ্যে পাঁচ জন এই

দুই পণ্ডিতের বিচার সমুদায় শুনিয়াছিল। তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল—"সিদ্ধার্থের ভাবগতিকে বোধ হয় যে, ইহাঁর কাছে থাকিলে আমাদিগের পরমার্থ লাভ হইবে। অতএব ইহাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকাই ভাল।" এই বলিয়া তাহারা সিদ্ধার্থের অনুগামী হইল। এই পাঁচ জনের নাম অজ্ঞাতকৌণ্ডিন্য, অশ্বজিত, ভদ্রক, বাষ্প এবং মহানাম।

সিদ্ধার্থ দক্ষিণদিকে কিয়দ্দূর গমন করিয়া পশ্চিমাভিমুখে গয়াশীর্ষ পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। তাহার সন্নিকটে নৈরঞ্জন এবং মহানদ বলিয়া দুই নদ কল্গুনদীর সহিত একত্রিত হইয়াছে। নৈরঞ্জনের ধারে উরুবিল্ব বলিয়া এক গ্রাম ছিল। তথায় তিনি উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অবশেষে অতিশয় প্রীতমনে বলিয়া উঠিলেন—"এই উরুবিল্ব-গ্রাম অতি সুন্দর স্থান। সম্মুখে বিস্তৃত অরণ্য শোভমান। এই নৈরঞ্জনে স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ বারি প্রবাহিত হইতেছে। দুই পারে স্নান করিবার অনেক ঘাট আছে। এবং চারিদিকে মনোহর গ্রামসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। মনে করিলেই তথায় যাওয়া যায়। যে কোন ব্যক্তি মোক্ষার্থী হইয়া উচ্চ আশা চরিতার্থ করিতে চায়, তাহার পক্ষে এই স্থানই বিশেষরূপে উপযোগী।" সিদ্ধার্থ এই স্থলে ছয় বৎসর কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

মৃচ্ছকটিক।

মৃচ্ছকটিক প্রাচীন উজ্জয়িনীর একখানি উজ্জ্বল সমাজচিত্র। ইহাতে তপোবন নাই, ঋষ্যাশ্রম নাই, মানবহৃদয়ের চতুষ্পার্শ্বে বহিঃপ্রকৃতি অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আসে নাই; কেবল উজ্জয়িনীর

রাজশ্যালক, সার্থবাহ, গণিকাকন্যা, ধর্ম্মাধিকরণ, বিলাসভবন ও বৌদ্ধ বিহার দিয়া তদানীন্তন সমাজের কতকগুলি সুন্দর চিত্র রচিত হইয়াছে এবং একটি প্রণয়কাহিনীসূত্রে এই সমস্ত চিত্রগুলি পরে পরে যথাশোভনরূপে গ্রথিত হইয়া মধ্যযুগের সংস্কৃত সভ্যতার একটি অখণ্ড আদর্শ গঠিত করিয়া তুলিয়াছে।

উজ্জয়িনী তখন ভারতবর্ষের মধ্যে মহা সমৃদ্ধিশালী নগরী। প্রশস্ত রাজপথের দুই পার্শ্বে সুসজ্জিত পণ্যবীথিকা, শ্রেণীবদ্ধ সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী ও নিত্য উৎসবময় বিলাসভবন; নগরপ্রান্তে অহরহ সঙ্গীতধ্বনিত প্রমোদকাননশ্রেণী, পাদমূল ধৌত করিয়া চঞ্চলা শিপ্রা কলস্বরে বহিয়া গিয়াছে। অদূরে বৌদ্ধ বিহার—পরিব্রাজকেরা সেখানে বসিয়া বৌদ্ধ নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন; এবং নগরীমধ্যে মহাকালমন্দিরে মহা সমারোহে প্রতিদিন ব্রাহ্মণদিগের শিবপূজা সম্পন্ন হয়।

এই চির-উৎসবময়ী উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠিচত্বরে দ্বিজসার্থবাহ চারুদত্তের বাস; এবং গণিকাকন্যা বসন্তসেনা এই নষ্টবিত্ত সম্ভ্রান্ত পৌরজনের গুণমুগ্ধা প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী। কিন্তু যাহার রূপ ও যৌবন দুই আছে মকরকেতন তাহার প্রণয়পথ কখনও নিষ্কণ্টক করেন না। বসন্তসেনার রূপযৌবন নষ্টচরিত্র রাজশ্যালকের শরীর মন নিরন্তর মদনানলে দগ্ধ করে। কিন্তু বসন্তসেনা গণিকাকন্যা হইলেও গণিকার মত তাঁহার স্বভাব নহে—সুতরাং শকারের ঐশ্বর্য্যপ্রভাব তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তিনি চারুদত্তের গুণাবলী শুনিয়া অবধি মনে মনে তৎপ্রতি অনুরাগবতী হইয়াছেন; এবং যে দিন কামদেবায়তনোদ্যানে চারুদত্তের দর্শন লাভ করিলেন, সে দিন হইতে সেই সৌম্যমূর্ত্তি ভিন্ন তাঁহার অন্তরে আর কিছুই স্থান পায় নাই।

কিন্তু নীচবংশ শকারের ইহা সহ্য হইবে কেন? সে ভগিনী-পতির অনুগ্রহপরিপুষ্ট হইয়া কেবলমাত্র অষ্টাদশ ব্যসন আয়ত্ত করিয়াছে; এবং উজ্জয়িনীতে নিশাচর দুর্জ্জনদিগের অগ্রণী বলিয়াই তাহার খ্যাতি। সন্ধ্যার পর তাহার ভয়ে যুবতীজনের একাকিনী পথে বাহির হইবার যো ছিল না। বসন্তসেনাকে একবার সুবিধামত পাইলে শকার কি সহজে ছাড়ে?

দৈবক্রমে কামদেবায়তন উদ্যান হইতে বসন্তোৎসব দেখিয়া ফিরিতে বসন্তসেনার সে দিন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। তখন শকার সদলবলে পথে বাহির হইয়াছে এবং পথ প্রায় জনশূন্য। সেই নির্জ্জন পথে একাকিনী পাইয়া শকার বিট ও চেটের সহিত বসন্তসেনার অনুগমন করিল। এবং নানাবিধ সম্বোধনে বসন্তসেনাকে দ্রুতগতি হইতে নিরস্ত হইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিতে লাগিল। বিট সাধুভাষায় বসন্তসেনার নৃত্যপ্রয়োগবিশদ চরণযুগলের প্রশংসা করিয়া ও ব্যাধানুসারচকিতা হরিণীর সহিত উপমা খাটাইয়া কথাগুলি একটু সাজাইয়া গুছাইয়া বলে। এবং শকার অত্যন্ত কুৎসিৎ গ্রাম্য ভাষায় আপন দারুণ অন্তর্জ্বালা ব্যক্ত করিতে থাকে; এবং কখনও "রামভয়ে পালায়মানা দ্রৌপদীর" সহিত, কখনও বা "রাবণের কুন্তীর" সহিত তুলনা করিয়া বসন্তসেনাকে স্বীয় শয্যাসঙ্গিনী করিবার আশ্বাস দেয়। কিন্তু বসন্তসেনার গতিবেগ যখন কিছুতেই মন্দীভূত হইল না, তখন আশ্বাসবচনের পরিবর্ত্তে অজস্র কটূকাটব্য বর্ষিত হইতে লাগিল এবং শকার একবার তাঁহার কেশগুচ্ছ ধারণ করিলে ভীমসেন, জমদগ্নিপুত্র, কুন্তীসুত প্রভৃতির বলবীর্য্যও যে ব্যর্থ হইবে বারবার করিয়া এ কথা বসন্তসেনার কর্ণগোচর করা হইল।

কিন্তু ইতিমধ্যে সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে বসন্তসেনা অনেকটা

পথ অতিক্রম করিয়া একেবারে চারুদত্তের পক্ষদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন চারুদত্তের জপসমাপ্তি হইয়াছে এবং বয়স্য মৈত্রেয় পরিচারিকা রদনিকা সমভিব্যাহারে মাতৃকাগণের পূজার্থে পক্ষদ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিতেছেন। দ্বার উন্মুক্ত হইতেই বসন্তসেনা তাড়াতাড়ি রদনিকার হস্তস্থিত দীপ নিবাইয়া দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। বাতাসে দীপ নিবিয়া গেল ভাবিয়া মৈত্রেয় পুনরায় দীপ জ্বালিয়া আনিতে গেলেন। ইতিমধ্যে শকার আসিয়া বসন্তসেনাভ্রমে রদনিকার কেশগুচ্ছ ধারণ করিল। মৈত্রেয় প্রদীপ লইয়া আসিতেই শকার রদনিকাকে ছাড়িয়া দিল। বিট মার্জ্জনা ভিক্ষাপূর্ব্বক এ ঘটনা যাহাতে চারুদত্তের কর্ণগোচর না হয় সে জন্য মৈত্রেয়কে বিস্তর অনুনয় সহকারে অনুরোধ করিল। কিন্তু শকারের আস্ফালন থামিল না। সে শাসাইয়া গেল যে, বসন্তসেনা আমাদের অনুনয় বিনয় অগ্রাহ্য করিয়া এই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, অতএব সেই গণিকাকন্যাকে প্রত্যর্পণ না করিলে কপাটতলপ্রবিষ্ট কপিত্থবৎ মড়মড়শব্দে চারুদত্তের মস্তক চূর্ণীকৃত হইবে জানিয়ো।

বাহিরে যখন এই কাণ্ড চলিয়াছে, গৃহাভ্যন্তরে তখন চারুদত্ত বসন্তসেনাকে রদনিকা ভাবিয়া পুত্র রোহসেনকে গৃহাভ্যন্তরে আনিতে আদেশ করিলেন এবং বসন্তসেনার প্রতি স্বীয় জাতী-কুসুমবাসিত উত্তরীয়খণ্ড নিক্ষেপ করিয়া তদ্দ্বারা রোহসেনের গাত্রাচ্ছাদন করিয়া দিতে বলিলেন। বসন্তসেনা নীরব নিশ্চল। আদেশ পালিত হইল না দেখিয়া চারুদত্ত ক্ষুণ্ণহৃদয়ে বলিলেন, হায় রদনিকে, আজ প্রতিবচন পর্য্যন্ত নাই—পুরুষের অবস্থাবিপর্য্যয়ে মিত্রও শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, চিরানুরক্তও বিরক্ত হয়।

কথা শেষ হইতে না হইতে রদনিকাকে লইয়া মৈত্রেয় প্রবেশ করিলেন। চারুদত্ত দেখিলেন যে, যাহার অঙ্গে উত্তরীয় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে সে রদনিকা নহে; কিন্তু যেই হোক্, ইহার অঙ্গে উত্তরীয় বড় শোভা পাইয়াছে।

"ছাদিতা শরদভ্রেণ চন্দ্রলেখেব দৃশ্যতে।"

মৈত্রেয় বসন্তসেনার পরিচয় দিয়া দিলেন। এবং কামদেবা-য়তনের কাহিনী ও রাজশ্যালকের দুর্ব্যবহারের কথাও প্রকাশ করিয়া বলিতে ক্রটি করিলেন না। চারুদত্ত কেবল বলিলেন "অজ্ঞোহংসৌ" এবং উত্তরীয়নিক্ষেপের জন্য বসন্তসেনার নিকট অপরাধ স্বীকারপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বসন্তসেনাও চারুদত্তের ন্যায় সম্ভ্রান্ত জনের গৃহে তাঁহার প্রবেশ অত্যন্ত অনুচিত কার্য্য হইয়াছে বলিয়া ক্ষমা চাহিলেন। ইহাই প্রথম সূচনা। তাহার পর রাজপথে বিপদাশঙ্কায় বসন্তসেনা অলঙ্কারগুলি চারুদত্তের নিকট গচ্ছিত রাখিলেন। এবং পরিশেষে চারুদত্তই তাঁহাকে গৃহে রাখিয়া আসিলেন।

এইখানে মৃচ্ছকটিকের প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হইল। এবং এই যে চারুদত্তের সহিত বসন্তসেনার সংস্পর্শ সূচিত হইল, দশ অঙ্কের মধ্য দিয়া বিবিধ বিপ্লবচক্রে ও বিচিত্র চিত্রে ইহাই ক্রমে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজা-কবি শূদ্রক গণিকাকন্যার এই প্রণয়বন্ধনে উজ্জয়িনীর সাময়িক সমাজনাট্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এবং অঙ্কে অঙ্কে এই প্রণয়ঘটনার চতুর্দ্দিকে বিলাসী উজ্জয়িনীর সমগ্র বিলাস অনুলিপ্ত হইয়াছে।

উজ্জয়িনীর তদানীন্তন সমাজ চিত্রিত করিতে হইলে এই বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নাই। গণিকা তখন নগরের শোভা বলিয়া গণ্য হইত এবং দ্যূতভবন তাহার ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক

ছিল। এবং এই দুই বিলাসের অনুগ্রহে উজ্জয়িনীতে চোরেরও অসদ্ভাব ছিল না। রজনীতে রাজপথে নগরের রক্ষকেরা যেমন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইত, গৃহস্থের প্রাচীরের ছিদ্রপথে সেইরূপ বহুসংখ্যক সুদক্ষ চোরেরও গতিবিধি ছিল। এবং বসন্ত-সেনার অলঙ্কারন্যাসের পর দরিদ্র চারুদত্তের ভবনেও চুরি হইল। চোর বসন্তসেনার অলঙ্কারগুলির একখানিও রাখিয়া গেল না, কেবল প্রাচীরগাত্রে বহুযত্নরচিত একটি দর্শনীয় ছিদ্রপথ রাখিয়া গেল যে, প্রভাতে উঠিয়া চারুদত্ত ও প্রতিবেশীবর্গ চোরকে কেবলমাত্র গালি না দিয়া তাহার শিল্পনৈপুণ্যেরও প্রশংসা করি-বার অবসর পান।

এই ঘটনায় চারুদত্তকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া মৈত্রেয় পরামর্শ দিলেন, সখে, যখন সাক্ষী কেহ নাই তখন এই অলঙ্কারন্যাসের কথা অস্বীকার করিলেই চলিবে—তুমি অতিমাত্র ভাবিত হইয়ো না। কিন্তু চারুদত্ত মিথ্যা বলিবার পাত্র নহেন। তিনি ভিক্ষা করিয়াও বসন্তসেনার গচ্ছিত ধন পরিশোধ করিবেন, তথাপি চরিত্রভ্রংশকারণ মিথ্যার শরণাপন্ন হইবেন না।—পত্নী ধূতা এই সংবাদ শ্রবণে অচিরে মৈত্রেয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এবং চারুদত্ত পাছে স্ত্রীর ধন লইতে কুণ্ঠিত হয়েন, রত্নষষ্ঠী ব্রত উদ্-যাপনছলে ব্রাহ্মণ মৈত্রেয়কে রত্নমালা দান করিয়া স্বামীর সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন।

চারুদত্তের আদেশে মৈত্রেয়ই বসন্তসেনা সমীপে সেই রত্নমালা লইয়া গেলেন। বসন্তসেনার প্রকাণ্ড আটমহল পুরী। পথের সম্মুখেই গগন স্পর্শ করিয়া দন্তিদন্তনির্ম্মিত তোরণ উঠিয়াছে এবং বিচিত্র পতাকাবলী নিয়ত বায়ুবেগে সঞ্চালিত হইয়া তোরণস্তম্ভ-সমূহের শোভা সম্পাদন করিতেছে। নিম্নে সুনির্ম্মিত প্রস্তর-

বেদিকার উপরে চূতপল্লবরম্য স্ফাটিক মঙ্গলকলসসমূহ সুসজ্জিত ; এবং দুর্ভেদ্য কনককপাট দারিদ্র্যকে সেই বিলাসপুরী হইতে নিরত দূরে রক্ষা করে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিবিধরত্নপ্রতিবদ্ধ কাঞ্চনসোপানশোভিত শুভ্র প্রাসাদশ্রেণী দর্শকের নয়ন ঝলসিয়া দেয়। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে গো-মহিষ-অশ্বশালা। শত শত পরিচারক দিবারাত্রি এইসকল হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ জীবগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। তৃতীয় প্রকোষ্ঠে কুলপুত্রগণের উপবেশন নিমিত্ত বহুবিধ আসন ; কোথাও মণিময় গুটিকাযুক্ত পাশকপীঠ, কোথাও বা পাশকপীঠোপরি অর্দ্ধপঠিত পুস্তক অনাবৃত পড়িয়া রহিয়াছে ; এবং মদনসন্ধিবিগ্রহচতুর গণিকা ও বৃদ্ধ বিটগণ বিবিধবর্ণবিলিপ্ত চিত্রফলকহস্তে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। চতুর্থ প্রকোষ্ঠে নিত্য যুবতিকরতাড়িত গম্ভীর মৃদঙ্গধ্বনি, মধুকরবিরুতমধুর বংশীরব ও কামিনীগণের নূপুরশিঞ্জনসহ তালে তালে নৃত্য। কোথাও নাট্যপাঠ হইতেছে, কোথাও গণিকাদারিকাগণ বিবিধ দেহভঙ্গী ব্যক্ত করিতেছে। এবং গবাক্ষে সলিলগর্গরীসকল বাতগ্রহণে শীতল হইতেছে। পঞ্চম প্রকোষ্ঠে হিঙ্গুগন্ধসুরভিত রন্ধনশালা—যেখানে আসিয়া বিবিধ মাংস ও পায়সাদির লোভে মৈত্রেয়ের রসনা সিক্ত হইয়া উঠিল এবং নিমন্ত্রণলাভের বৃথা আশায় মন চঞ্চল হইতে লাগিল। ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠের তোরণ সুবর্ণনির্ম্মিত এবং গৃহতল নীলমণিপরিশোভিত। উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণ বৈদূর্য্য মৌক্তিক প্রবালক পুষ্পরাগ ইন্দ্রনীল পদ্মরাগ মরকত প্রভৃতি রত্নরাশি লইয়া পরীক্ষা ও অলঙ্কারনির্ম্মাণ করিতেছে। কোথাও মদিরাপান চলিয়াছে, দাসীগণ কর্পূরসুবাসিত তাম্বূল বিতরণ করিতেছে এবং হাস্যপরিহাসের বিরাম নাই। সপ্তম প্রকোষ্ঠে পক্ষীশালা। অন্যোহন্যচুম্বনরত কপোতমিথুন, সুভাষিণী মদনসারিকা, পর-

পুষ্টা কোকিলা প্রভৃতি নানা জাতীয় বিহঙ্গকুল এই বিহঙ্গবাটিকায় সুখে নিষণ্ণ। অষ্টম প্রকোষ্ঠে বসন্তসেনার আত্মীয় স্বজনেরা বাস করে। বসন্তসেনার মাতাকে দেখিয়া মৈত্রেয় চেটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তৈলচিক্কণ পদযুগল উপানৎ মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া উচ্চাসনোপবিষ্টা পুষ্পপ্রাবারকপ্রাবৃতা ঐ রমণীটি কে? চেটী উত্তর করিল, ইনিই আমাদের আর্য্যার জননী। মৈত্রেয় আর্য্যার মাতার দৈহিক পরিধি দেখিয়া উপহাসরসিকতার লোভটুকু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। চেটীকে বলিলেন, ইহাঁর যেরূপ আয়তন দেখিতেছি, বোধ করি বৃহৎ শিবলিঙ্গের ন্যায় ইহাঁকে অগ্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরে চতুষ্পার্শ্বে এই প্রাচীর ও দ্বারসকল নির্ম্মিত হইয়াছে। চেটী বলিল, ঠাকুর, উপহাস করিবেন না, ইনি চাতুর্থিকে অত্যন্ত কাতর আছেন। মৈত্রেয় প্রার্থনা করিলেন, ভগবন্ চাতুর্থিক, তুমি এই দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তানের প্রতি একবার কৃপা কর।

এইরূপে মুগ্ধ মৈত্রেয়ের মুখ দিয়া মৃচ্ছকটিককার বসন্তসেনার পুরী বর্ণনা করিয়াছেন। এবং প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে যাইতে বিলাসের এক একটি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সংস্কৃত নাটককারেরা এইরূপ আনুপূর্ব্বিক চিত্রন্যস্ত বর্ণনা করিতে যেন কিছু ভালবাসেন। কালিদাসের শকুন্তলাও প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবলি চিত্রাঙ্কিত—এমন কি, ছোটখাট উপমাগুলিও এক একটি সুন্দর চিত্রে উদ্ভাসিত। মৃচ্ছকটিকও নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে এইরূপ একটি চিত্রপরম্পরা বলিয়াই প্রতিভাত হয়। তবে কালিদাসের নাটকের মত ইহাতে কেবলি সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সমাবেশ নহে। বাস্তব জগতের দুই চারিটা নাতিসুন্দর স্থূল দৃশ্যও ইহাতে আছে। কালিদাস বসন্তসেনার আলয়ে

প্রবেশ করিলে তদীয়া স্থূলাঙ্গী জননীটিকে মৈত্রেয়ের সমক্ষে কিছুতেই বাহির করিতেন না। একেবারে নৃত্যগীত মদিরা উৎসব ও রূপসীগণের অর্দ্ধ-অনাবৃত চারু যৌবনের মধ্য দিয়া মৈত্রেয়কে বসন্তসেনার বৃক্ষবাটিকায় লইয়া যাইতেন—যেখানে যুবতীগণের সনূপুর পাদতাড়নে অশোকতরু মুকুলিত হইয়া উঠে এবং সেই অশোকশাখা হইতে বিলম্বিত দোলায় বসিয়া মৃদু সান্ধ্যপবনে দূর মৃদঙ্গধ্বনির তালে তালে বসন্তসেনা যৌবনের আন্দোলনসুখ অনুভব করেন।

অষ্টম প্রকোষ্ঠের পর এই বৃক্ষবাটিকা। চেটী মৈত্রেয়কে বরাবর সেইখানে লইয়া গেল। বসন্তসেনা সেইখানেই ছিলেন। পরস্পরের কুশলজিজ্ঞাসাদি সমাপনান্তে মৈত্রেয় বলিলেন যে, চারুদত্ত দ্যূতক্রীড়ায় আপনার গচ্ছিত অলঙ্কারগুলি হারাইয়া তৎপরিবর্ত্তে এই রত্নমালা প্রেরণ করিয়াছেন। বসন্তসেনা অলঙ্কারগুলির সন্ধান পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। তাঁহারই পরিচারিকা মদনিকার প্রণয়ী শর্ব্বিলক নামক এক ব্রাহ্মণসন্তান প্রণয়িনীকে নিষ্ক্রয়দানে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিতে এই কার্য্য করিয়াছে। এবং এই ঘটনা প্রকাশ হইবার পর মদনিকাকে তিনি শর্ব্বিলকের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু মৈত্রেয়কে সে কথা না বলিয়া, রত্নমালা গ্রহণপূর্ব্বক, প্রদোষে চারুদত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন বলিয়া বিদায় করিলেন।

মৈত্রেয় গিয়া চারুদত্তকে সমস্ত বলিলেন। এবং ঝড়বৃষ্টি বিদ্যুতের মধ্য দিয়া যথাসময়ে ছাতা মাথায় দিয়া বসন্তসেনা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সংস্কৃত কবির নিকট বর্ষাবর্ণনা কখনও ফাঁক যায় না—বিশেষতঃ যখন এমন একটি প্রণয়কাহিনীর সুবিধা আছে। মৃচ্ছকটিককার নানা ছন্দে এই মেঘ ঝঞ্চা

অশনি বর্ণনা করিয়াছেন এবং গুরুগুরু বর্ষাবর্ণনায় একদিকে শোকার্ত চারুদত্ত ও অন্যদিকে অভিসারিকা বসন্তসেনার মনে প্রকৃতিকে প্রেমার্দ্র করিয়া তুলিয়াছেন। এবং বিদ্যুৎ যখন অম্বরকে ঘন ঘন আলিঙ্গন করিতে লাগিল, কবি আর থাকিতে পারিলেন না—চারুদত্ত ও বসন্তসেনাকে পরস্পরের গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া অঙ্কশেষ করিলেন।

"বর্ষশতমস্তু দুর্দিনমবিরতধারং শতহ্রদা স্ফুরতু।
অস্মদ্বিধদুর্লভয়া যদহং প্রিয়য়া পরিষ্বক্তঃ॥"

কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইল। চারুদত্ত ভৃত্য বর্দ্ধমানককে শকট ঠিক করিয়া বসন্তসেনাকে পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে লইয়া যাইতে বলিয়া গিয়াছেন। বসন্তসেনা গাত্রোত্থান করিয়া ধূতা দেবীর সংবাদ লইলেন:—

বস। অবি সন্তপ্পদি চারুদত্তস্স পরিঅণো?
চেটী। সন্তপ্পিস্সদি।
বস। কদা?
চেটী। জদা অজ্জআ গমিস্সদি।
বস। তদো মএ পঢমং সন্তপ্পিদব্বম্।*

তদনন্তর তিনি আর্য্যা ধূতার নিকট এই বলিয়া সেই রত্নাবলী পাঠাইয়া দিলেন যে, আমি চারুদত্তের গুণনির্জ্জিতা দাসী, আপনারও দাসী, অতএব এই রত্নাবলী যোগ্য কণ্ঠে ন্যস্ত হউক।

ধূতা বলিয়া পাঠাইলেন—তাহাও কি হয়? আর্য্যপুত্র প্রসন্ন-

---

* বস। চারুদত্তের পরিজন কি সন্তপ্ত হইতেছেন?
চেটী। সন্তপ্ত হইবেন।
বস। কখন?
চেটী। যখন আর্য্যা চলিয়া যাইবেন।
বস। তবে আমাকেই প্রথম সন্তপ্ত হইতে হইবে।

মনে যাহা আপনাকে দান করিয়াছেন তাহা আমি লইব কেন? আর্য্যপুত্রই আমার একমাত্র আভরণ।

এমন সময় রদনিকা রোহসেনকে লইয়া প্রবেশ করিল। রোহসেন মৃৎশকটিকার পরিবর্ত্তে সুবর্ণশকটিকা লইয়া খেলা করিতে চায়। দাসী তাহাকে বুঝাইতেছে যে, তোমার পিতার আবার ধন হউক্, সকলি হইবে। বসন্তসেনা চারুদত্তের পুত্রকে বাহু প্রসারণপূর্ব্বক ক্রোড়ে লইলেন। এবং বালক সুবর্ণশকটিকার জন্য কাঁদিতেছে শুনিয়া স্বীয় অলঙ্কারগুলি খুলিয়া দিলেন—ইহার দ্বারা তুমি সুবর্ণশকটিকা প্রস্তুত করাইয়া লইয়ো।

শূদ্রক বসন্তসেনাকে বরাবরই নারীহৃদয়ের এই স্বাভাবিক সৌকুমার্য্যে বিভূষিত করিয়াছেন। এ স্নেহ গণিকাসুলভ নহে—নারীহৃদয়ের অতি গভীর তল হইতে ইহা উৎসারিত। রোহসেনকে দেখিয়াই চারুদত্তগতপ্রাণার হৃদয়ে মাতৃস্তনে ক্ষীরসঞ্চারের ন্যায় এই অনির্ব্বচনীয় বাৎসল্য সঞ্চারিত হইয়াছে। প্রিয়জনের পরিজনবর্গকেও প্রেম এমনি আপনার করিয়া তোলে।

কিন্তু শকট সুসজ্জিত। আর বিলম্ব করা চলে না। বর্দ্ধমানক চেটীকে দিয়া সংবাদ পাঠাইল যে, বসন্তসেনার জন্য পক্ষদ্বারে কর্ণীরথ অপেক্ষা করিতেছে। বসন্তসেনা আর একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন—তখনও তাঁহার প্রসাধনক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। বর্দ্ধমানক যানের আচ্ছাদন ফেলিয়া আসিয়াছিল, তাড়াতাড়ি তাহা ঠিক করিয়া আনিতে গেল। ইতিমধ্যে বসন্তসেনা আসিয়া শকটে উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু দৈবক্রমে সে শকট চারুদত্তের নহে, তাহা রাজশ্যালক সংস্থানকের।

চারুদত্তের শকটও শূন্য গেল না। তাহাতে আর্য্যক নামে এক রাজবিদ্রোহী গোপপুত্র উঠিয়া বসিয়াছেন। সে সময়ে

রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য উজ্জয়িনীতে এক চক্রান্ত চলিয়াছিল। লোকমুখে একটা ভবিষ্যদ্বাণী রটনা হইয়াছিল যে, উজ্জয়িনীরাজ পালককে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎপদে আর্য্যক নামে এক গোপপুত্র অভিষিক্ত হইবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী রটনার ফলে অসন্তুষ্ট প্রজাবর্গের অনেকেই গোপনে আর্য্যকের দলভুক্ত হইয়াছিল। শকট যখন পুষ্পকরণ্ডকে আসিয়া পঁহুছিল, চারুদত্ত বসন্তসেনাকে নামাইয়া লইতে আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে বিস্মিত হইলেন।

"করিকরসমবাহুঃ সিংহপীনোন্নতাংসঃ
পৃথুতরসমবক্ষাস্তাম্রলোলায়তাক্ষঃ।
কথমিদমসমানং প্রাপ্ত এবংবিধো যো
বহতি নিগড়মেকং পাদলগ্নং মহাত্মা॥" *

জিজ্ঞাসা করিলেন, "ততঃ কো ভবান্?"—আর্য্যক স্বীয় পরিচয় দিলেন। চারুদত্ত বলিলেন,

"বিধিনৈবোপনীতত্ত্বং চক্ষুর্বিষয়মাগতঃ।
অপি প্রাণানহং জহ্যাং নতু ত্বাং শরণাগতম্॥" †

এবং তাঁহার নিগড় অপনীত করাইয়া দিয়া তাঁহাকে সেই শকটেই রাজপুরুষদিগের দৃষ্টির বাহিরে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিলেন।

এদিকে বসন্তসেনা পড়িলেন শকারের হাতে। সে প্রথমে প্রবহণ মধ্যে উঁকি মারিয়াই স্থির করিল, গাড়ীতে চড়িয়া নিশ্চয় কোন রাক্ষসী আসিয়াছে। বিট গিয়া দেখিল, বসন্তসেনা।

---

* করিকরসমবাহু, সিংহপীনোন্নতাংস, বিশালবক্ষ, তাম্রলোলায়তচক্ষু, এইসকল মহাপুরুষলক্ষণাক্রান্ত হইয়াও ইনি পাদলগ্ন নিগড় বহন করিতেছেন কেন?

† আপনি দৈবকর্ত্তৃকই এখানে উপনীত হইয়া আমার চক্ষুগোচর হইলেন। প্রাণও যদি ত্যাগ করিতে হয়, শরণাগত আপনাকে ত্যাগ করিতে পারিব না।

বসন্তসেনা বিটের শরণাপন্ন হইলেন। বিট তাঁহার কথা প্রকাশ করিল না। বরঞ্চ যাহাতে শকার প্রবহণ ছাড়িয়া পলায়ন করে তৎপক্ষে চেষ্টা করিল। কিন্তু রাজশ্যালক গাড়ী ছাড়িয়া পদব্রজে যাইতে রাজি হয় না। তখন অগত্যা বসন্তসেনার কথা প্রকাশ হইল। শকার একেবারে তাঁহার চরণে পড়িয়া আরম্ভ করিল,

"এশে পড়েম্মি চলণেশু বিশালণেত্তে
হত্থঞ্জলিং দশণহে তব শুদ্ধদত্তি।
জং তং মএ অবকিদং মদণাতুলেণ
তং খম্মিদাশি বলগত্তি তব ম্হি দাশে॥" *

কিন্তু বসন্তসেনা আহতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তখন শকার ক্রুদ্ধ হইয়া বিটকে বলিল, এই স্ত্রীলোকটাকে মারিয়া ফেল। বিট সম্মত হইল না। বলিল যে, নগরের শোভা কুলকামিনীসদৃশা প্রণয়বতী এই তরুণী নিরপরাধাকে হত্যা করিয়া পরলোকনদী উত্তীর্ণ হইব কিরূপে?

শকার উত্তর করিল, আমি ভেলার ব্যবস্থা করিব। এখানে হত্যা করিলে কে দেখিবে?

বিট বলিল, দেখিবে অনেকে,

"পশ্যন্তি মাং দশদিশো বনদেবতাশ্চ
চন্দ্রশ্চ দীপ্তকিরণশ্চ দিবাকরোঽয়ম্।
ধর্ম্মানিলৌ চ গগনঞ্চ তথান্তরাত্মা
ভূমিস্তথা সুকৃতদুষ্কৃতসাক্ষিভূতা॥" †

---

* হে বিশালনেত্রে, তোমার চরণে পতিত হইতেছি, হে দশনথে, শুদ্ধদন্তি, তোমার নিকট হস্তাঞ্জলি করিতেছি। মদনাতুর আমা কর্ত্তৃক তুমি যে অপকৃত হইয়াছিলে তাহা ক্ষমা করিয়াছ—হে বরগাত্রি, আমি তোমার দাস।

† আমাকে দেখিতেছেন, দশদিক্, বনদেবতাসকল, চন্দ্র, দিবাকর, ধর্ম্ম, অনিল, গগন, অন্তরাত্মা এবং সুকৃতদুষ্কৃতসাক্ষিভূতা ভূমি।

শকার বলিল, তবে বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া হত্যা কর—কেহ দেখিতে পাইবে না।

বিট আর থাকিতে পারিল না—"মূর্খ অপধ্বস্তোঽসি" বলিয়া গালি দিয়া বসিল।

তখন শকার চেটকে এই হত্যাকাণ্ড সম্পাদনার্থে আদেশ করিল। সেও প্রভুবাক্য পালন করিতে অসম্মত হইল।

শকার বলিল, তবে আমি স্বহস্তেই ইহাকে বিনাশ করি।

বিট তাহাতে বাধা দিল। বলিল, খবরদার, আমাদের সম্মুখে স্ত্রীহত্যা করিয়া তুমি কখনও নিষ্কৃতি পাইবে না।

বিপদ দেখিয়া শকার পুনরায় মদনশরাহতের ন্যায় বসন্তসেনাকে "বাস্থু বাস্থু" সম্বোধন করিতে লাগিল। বিট ও চেট এই ভাব দেখিয়া প্রস্থান করিল। এবং তখন শকার নির্ভয়ে বসন্তসেনার গলা টিপিয়া ধরিল। চারুদত্তের নাম গ্রহণ করিতে করিতে তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। মৃতা ভাবিয়া শকার তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিল। এবং ধর্ম্মাধিকরণে গিয়া চারুদত্তের নামে এই হত্যাভিযোগ উপস্থিত করিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে শ্রেষ্ঠিকায়স্থসহ অধিকরণিক বিচার করিতে বসিলেন। অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণাদি গৃহীত হইল। বসন্তসেনার মাতা আসিয়াও রাজশ্যালকের কথার অনুকূলে সাক্ষ্য দিল। বিস্তর বিচারবিতর্কের পর অধিকরণিক চারুদত্তকেই অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন। এবং তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ বাহির হইল।

এদিকে বসন্তসেনাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় পতিত দেখিয়া একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু নিকটস্থ বিহারে লইয়া গিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।—বৌদ্ধধর্ম্ম উজ্জয়িনীতে তখনও প্রবল ছিল

বলিয়া বোধ হয়। এবং তদানীন্তন নাটকাদিতে শিবের নামে নান্দী থাকিলেও বৌদ্ধদিগের প্রতি বিশেষ একটু সহানুভূতি দৃষ্ট হয়।—আমাদের ভিক্ষু বসন্তসেনাকে দেখিয়াই চিনিয়াছেন—ইনিও বুদ্ধেরই একজন শরণাগতা। ভিক্ষুটিও বসন্তসেনার পরিচিত—নাম সংবাহক। বসন্তসেনা এক সময়ে ইহাঁকে স্বীয় বলয় বিক্রয় করিয়া দ্যূতাধ্যক্ষের ঋণ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এখন এই ভিক্ষুর সেবা শুশ্রূষায় তিনি মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধৃত হইলেন।

এইরূপে কথনও পারিবারিক শান্তির চিত্র, কথনও গণিকালয়, কথনও দ্যূতশালা, কথনও সন্ধিচ্ছেদ, কথনও ধর্ম্মাধিকরণ, কথনও বৌদ্ধ বিহার, কথনও শ্রমণক, কথনও বা রাজশ্যালক, নানা চিত্রের মধ্য দিয়া মৃচ্ছকটিকের আখ্যায়িকা অগ্রসর হইয়াছে। সকল চিত্রগুলি চিত্ররূপে পরিস্ফুট করিয়া দেখান আমাদের এ স্বল্প স্থানে অসম্ভব। তৃতীয় অঙ্কে সামান্য চৌর্য্যঘটনা লইয়াই মৃচ্ছকটিককার কতগুলি চিত্র দিয়াছেন! দ্বিতীয় অঙ্কে সংবাহক ও মাথুরের দ্যূতদৃশ্যে দ্যূতশালার কত চিত্র আছে! এমন প্রতি অঙ্কে উজ্জয়িনীসমাজের ছোট বড় চিত্র কি যে না বর্ণিত হইয়াছে বলা কঠিন। এবং এই সমস্ত ঘটনা ও চরিত্রচিত্রাবলী দশম অঙ্কে বধ্যভূমিতে গিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। সেখানে চণ্ডালেরা চারুদত্তকে শূলে দিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সহসা কোথা হইতে জীবিতা বসন্তসেনা আসিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড রহিত করিলেন। দুন্দুভিরবে চতুর্দ্দিকে পুরাতন রাজার সিংহাসনচ্যুতি ঘোষিত হইল। আর্য্যক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। শকার চারুদত্তের পায়ে লুটাইয়া পড়িল। চারুদত্তের অনুরোধে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। রাজাদেশে বসন্তসেনা চারু-

দত্তের ধর্ম্মপত্নীরূপে গৃহীত হইলেন। ধূতা দেবী তাঁহাকে সাদরে ডাকিয়া লইলেন। সংবাহক সর্ব্ববিহারের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিলেন। এবং সর্ব্বত্র শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।—এই বধ্যভূমিতে সমস্ত উজ্জয়িনীসমাগমে মৃচ্ছকটিকের উপযুক্ত উপসংহার।

নিহিলিষ্ট-তত্ত্ব।

বর্ত্তমানকালে য়ুরোপের রাজনৈতিক অরণ্যে কতকগুলি দুর্দ্দান্ত বিপ্লবকারী দস্যু স্থানে স্থানে আড্ডা গাড়িয়াছে; ইহাদের মধ্যে আজকাল নিহিলিষ্ট ও সোশিয়ালিষ্ট সম্প্রদায় প্রধান। কোথাও কিছু নাই, মধ্যে হইতে ইহাদের একজন এমন এক দুর্ঘটনা ঘটাইয়া বসে যে, মুহূর্ত্তের মধ্যে চতুর্দ্দিকে মহাহুলস্থুল পড়িয়া যায় এবং তাহার প্রতিধ্বনিতে সমগ্র য়ুরোপের কানে তালা লাগে; সমুদ্র অতিক্রম করিয়া তাহার দুই একটি ক্ষীণ ধ্বনি যে, আমাদের কর্ণকুহরেও প্রবেশ করে না, এমন নহে। অতএব এরূপ অবস্থায় নিহিলিষ্টসম্প্রদায় সম্বন্ধে যদি কোন তথ্য জানিতে পারা যায়, তবে আশা হয় যে, বঙ্গীয় পাঠকমহলে তাহা কিঞ্চিৎ কৌতূহলজনক হইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে কোন ইংরাজী পত্রিকায় ফিলিপ্স্ নামক একজন সাহেব নিহিলিষ্টসম্প্রদায় সম্বন্ধে দুই একটি কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "লণ্ডনপ্রবাসী জনৈক বন্ধুবরের নিকট হইতে আমি নিহিলিষ্ট সম্প্রদায় সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। বন্ধুবর নিজে নিহিলিষ্ট, এবং তিনি নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষিত; তাঁহার সাম্প্রদায়িক

রহস্য সম্বন্ধে আমি অবশ্য তাঁহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি নাই এবং জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতেন না, কিন্তু নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের সাধারণ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি কোন কথা গোপন করেন না।"

অনেকের বিশ্বাস নিহিলিষ্টরা নিরীশ্বরবাদী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। যে কোন ব্যক্তি, তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস যাহাই হউক না কেন, ইচ্ছা করিলেই নিহিলিষ্টদলভুক্ত হইয়া এই সম্প্রদায়ের গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারেন। এজন্য তাঁহার পূর্ব্বের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করা আবশ্যকীয় নহে; তবে তাঁহাকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে, মনুষ্যজাতির কল্যাণের জন্য, প্রয়োজন হইলে তিনি শুধু ধর্ম্মবিশ্বাস কেন, জীবনের অবলম্বনীয় সমস্ত বস্তুই ত্যাগ করিবেন। নিহিলিষ্টরা এক অর্থে নাস্তিক বটে, কারণ, পরমেশ্বরের চৈতন্যস্বরূপ সত্তায় ইহাদের বিশ্বাস নাই; যদিই বা ইহারা তাঁহার সত্তা স্বীকার করে, তথাপি পার্থিব ঘটনাবৈচিত্র্যে যে, তাঁহার কোন হাত আছে এ কথা ইহারা কিছুতেই স্বীকার করিবে না। ইহাদের বিশ্বাস মনুষ্য-জীবনের প্রত্যেক কার্য্য মনুষ্যেরই আয়ত্তাধীন। একজন বিশ্বাসী খৃষ্টান নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে তাঁহাকে অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান যুগে পরমেশ্বর এ পৃথিবীর ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ করেন না, এইজন্য যদি আমরা এমন কোন কাজ করি যাহা প্রথমদৃষ্টিতে অপকারী হইলেও তাহার শেষফল মঙ্গলজনক হইতে পারে, তবে সেই কার্য্যসাধনের জন্য যে-কোন মানবীয় বা ঐশ্বরিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে আমাদের অধিকার আছে। মনুষ্যসমাজকে দুর্গতির হস্ত হইতে রক্ষা করাই নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র। ধর্ম্ম, রাজনীতি, অর্থ-

নীতি, নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধীয় কোন যুক্তিতর্কের ভিতরই ইহারা আসিতে চাহে না; এমন কি, "উদ্দেশ্য পালনের" জন্য পবিত্র মনুষ্যজীবনকেও ইহারা নগণ্য জ্ঞান করে। নিহিলিষ্ট-দিগের পূর্ণ বিশ্বাস এই যে, পৃথিবী দুঃখদারিদ্র্য ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ, অতএব এই পৃথিবীর সংস্কার অবশ্য প্রয়োজনীয়। যদি তাহাদের বুঝাইতে যাওয়া যায় যে, এখন পৃথিবী যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে তাহা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের ফলমাত্র, তাহা হইলে তাহারা এই সকল নিয়মকে পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণের কপোলকল্পিত বিধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।

নিহিলিষ্টদিগের প্রথম কর্ত্তব্য মনুষ্যজাতির দুঃখ দূর করা। একজন নিহিলিষ্ট তাঁহার পিতামাতা এবং পরিবারবর্গের একমাত্র আশ্রয় হইতে পারেন, কিম্বা তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গকে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম জ্ঞান করিতে পারেন, কিন্তু মনুষ্যজাতির প্রতি কর্ত্তব্য তাঁহার শ্রেষ্ঠতম ব্রত। যে ব্যক্তি স্ত্রীপুত্র, পিতামাতা, ভ্রাতাভগিনী এবং আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে সমগ্র মানবসমাজ অপেক্ষা অধিক ভালবাসে নিহিলিষ্টদিগের মতে জীবন সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞান নাই, এবং তাহার জীবনধারণও নিরর্থক। কোন্ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করিলে এই পৃথিবীর বর্ত্তমান দুরবস্থা দূর হইতে পারে নিহিলিষ্টগণ তাহা নির্দ্ধারণের জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত নহে। তাহাদের লক্ষ্য, যেমন করিয়াই হোক্ কার্য্যোদ্ধার করা চাই; এজন্য অগ্নিকাণ্ড, নরহত্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সংবাদপত্রে আন্দোলন এবং সভাস্থলে বক্তৃতা পর্য্যন্ত কার্য্যোদ্ধারের সকল প্রকার উপায়কেই ইহারা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করে। সমস্ত উপায়ই প্রশংসনীয় এবং অবলম্বনীয় যদি তাহাতে কিছুমাত্রও ফললাভ হয়।

ফিলিপ্‌স্ সাহেব বলেন, বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের সহিত নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। পরকাল সম্বন্ধে ইহারা সম্পূর্ণ উদাসীন, সুতরাং ইহাদের মৃত্যুভয় নাই। মনুষ্যজাতির মঙ্গলের জন্য যথাকর্ত্তব্য সংসাধন করাই ইহাদের ইহজীবনের চরম লক্ষ্য। পৃথিবীর যে অবস্থায় ইহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে মৃত্যুকালে যদি তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত অবস্থা দেখিতে পায় তাহা হইলেই ইহাদের পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার হইবে। ইহারা বলে শুদ্ধ স্বার্থপর লোককে প্রলোভিত করিবার জন্যই পরলোকে পুরস্কার অথবা দণ্ডবিধানের বিধি কল্পিত হইয়াছে।

নিহিলিষ্টগণ বলে, যে সকল সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খল মত অনেক সময় পৃথিবী কলঙ্কিত করিয়াছে নিহিলিষ্ট সম্প্রদায় সেরূপ কোন মতের অনুমোদন করে না। একজন অতি উদ্যমশীল নিহিলিষ্ট কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র, অনুরক্ত স্বামী, স্নেহময় পিতা, এবং বিশস্তহৃদয় বান্ধব হইতে পারেন; তাঁহার প্রকৃতি অতি দয়ালু হইতে পারে, এবং নরহত্যা দূরের কথা কাহাকেও সামান্য যন্ত্রণা দিতেও তাঁহার হৃদয়ে কষ্ট অনুভব হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু যদি তাঁহার "উদ্দেশ্য সাধনের" জন্য প্রয়োজন হয় তবে তাঁহাকে হৃদয় হইতে এই সকল প্রবৃত্তি মুহূর্ত্তের মধ্যে বিদূরিত করিতে হইবে। বিশ্বাস যেমন ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ, লোকাচার তাহার আনুষঙ্গিক নিয়মমাত্র; সেইরূপ উদ্দেশ্যসাধনই ইহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত, জীবনের অন্যান্য কর্ত্তব্য প্রবহমান জীবনস্রোতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদমাত্র।

সুতরাং নিহিলিষ্টগণ যে একটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, একাগ্রচিত্ত সম্প্রদায় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ইহারা